বজ্রশক্তি
সংকলন
রেজি: ডিএ ৬২৬১, সংখ্যা-২৫
আশ্বিন ১৪২৮ | অক্টোবর ২০২১ | সফর ১৪৪৩
৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

৯/১১ হামলার বিশ বছর

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফল কী হলো?

পৃ: ৮

পৃ: ২

ঝুঁকিতে তরুণ প্রজন্ম!

পৃ: ১৬

মহাশক্তি ঈমানের অপব্যবহার আর নয়

ভাইয়ের হাতে ভাই খুন
স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন
মায়ের হাতে সন্তান খুন
সন্তানের হাতে বাবা খুন
বাবা কর্তৃক মেয়ে ধর্ষণ

পৃ: ৫

– এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়?

সম্পাদকীয়

যা থাকছে এবারের সংকলনে

দৈনিক বজ্রশক্তিতে মাসব্যাপী ছাপা হওয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনসমূহ সংকলন আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদেরকে যে কঠিন কাজটি প্রতিবারই করতে হয় তাহলো- অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লেখার মধ্য থেকে অল্প কয়েকটি লেখা বেছে নিতে হয়। এটা মোটেও সহজ কাজ নয়। কেননা, গত সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী দৈনিক বজ্রশক্তিতে বহু বিষয়ে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে একাধিক লেখা স্থান পেয়েছে এবং সবগুলো লেখাই সংশ্লিষ্ট অঙ্গনের পাঠকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় আমরা চেষ্টা করেছি সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে যে বিষয়সমূহ বেশি আলোচিত হচ্ছে, ওই বিষয়ক লেখাগুলোই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে। আশা করছি পাঠকরা আমাদের সীমাবদ্ধতাকে মার্জনা করবেন। এবারের সংকলনের আন্তর্জাতিক পাতাজুড়ে রয়েছে ৯/১১ হামলার বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন। এই লেখায় ৯/১১ হামলার প্রেক্ষাপট, হামলাকারীদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও হামলার প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে। চলতি শতাব্দীর আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে ৯/১১ এর হামলা এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে, বলা হয়ে থাকে এই হামলা পৃথিবীর চেহারা বদলে ফেলেছে! ৯/১১ এর মর্মান্তিক হামলার ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করেছে। তা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোট বিশ্বব্যাপী বহু যুদ্ধ-সংঘাতের জন্ম দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে প্রতিবেদনে। প্রবন্ধ সংকলনে বাংলাদেশের সমাজের একটি ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে একটি প্রবন্ধে। যেখানে লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আমাদের পারিবারিক বন্ধনের অবক্ষয়ের চরমতম রূপ! দেখা যাচ্ছে পরিবারের সদস্যরাই সামান্য বৈষয়িক স্বার্থে আপনজনকে খুন করছে, পাষণ্ড সন্তানের হাতে বাবা খুন হচ্ছে, বাবার হাতে ছেলে খুন হচ্ছে, মায়ের হাতে সন্তান খুন হচ্ছে, ভাইয়ের হাতে ভাই খুন হচ্ছে, এমনকি বাবার দ্বারা কন্যা সন্তান ধর্ষিত হচ্ছে। এই চিত্র ভয়াবহ অশনিসংকেত দিচ্ছে বাংলাদেশের চিন্তাশীল মানুষকে। চিন্তাশীল মহলের আরেকটি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তরুণ প্রজন্মের অনলাইন গেমসে আসক্ত হয়ে পড়ার ঘটনাগুলো। অনলাইন গেমস শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক মনোবিকাশ ও সুস্থাস্থ্যের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে উঠেছে। এ থেকে পরিত্রানের উপায় খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা। এ নিয়ে বিস্তারিত উঠে এসেছে একটি প্রবন্ধে। ধর্মীয় অঙ্গনেও কেবলই হতাশার ছায়া। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, জনগণের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি, অপরাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ধর্মের অপব্যবহার, দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন করে ধর্মীয় উগ্রপন্থার বিকাশ ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা সঙ্কট ইত্যাদি সমসাময়িক অন্যান্য বিষয়েও বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা, মতামত, প্রশ্ন, উদ্বেগ ও প্রস্তাবনা উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি লেখায় যা পাঠকদের চিন্তায় যথেষ্ট খোরাক যোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সূচিপত্র

- ঝুঁকিতে তরুণ প্রজন্ম!. ২
- এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়? ৫
- ৯/১১ হামলার বিশ বছর, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফল কী হলো?. ৮
- ইসলামে নারীশিক্ষা ১২
- মহাশক্তি ঈমানের অপব্যবহার আর নয় ১৬
- দীন প্রতিষ্ঠা বলতে আমরা কী বুঝি?. ১৯
- রসুলাল্লাহর (দ.) ক্রোধ ও ক্ষমা ২১
- সালাহ উম্মতে মোহাম্মদীর চারিত্রিক প্রশিক্ষণ. ২৫
- সাইবার অপরাধ বাড়ছেই অভিযুক্ত ধর্মীয় নেতারাও . . ২৭
- ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ত্যাগী সংগঠনগুলোও ব্যর্থ হচ্ছে কেন? ৩০

প্রকাশক ও সম্পাদক:
এস এম সামসুল হুদা
১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপদেষ্টামণ্ডলী:
মসীহ উর রহমান
উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
রুফায়দাহ পন্নী

প্রচ্ছদ ও লেআউট কম্পোজিশন:
হেলাল উদ্দিন

বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:
২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
০২-৪৭২১৮১১১, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪

বিজ্ঞাপন বিভাগ:
০১৬৩৪-২০৮০৩৯

ওয়েব:
www.bajroshakti.com
facebook.com/dailybajroshakti

ই-মেইল:
bajroshakti@gmail.com

ঝুঁকিতে তরুণ প্রজন্ম!

জিনাত ফেরদাউস

গত ১৬ই আগস্ট বাংলাদেশে সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে পাবজি, ফ্রি ফায়ারসহ ক্ষতিকর সব অনলাইন গেমস আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় মহামান্য হাইকোর্ট। (ছবি: ইন্টারনেট)

- **অনলাইন গেমে আসক্তি বাড়ছেই।**
- **বন্ধ করা যাচ্ছে না পাবজি, ফ্রি ফায়ার।**
- **শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত!**

শিশু-কিশোর ও তরুণদের মানসিক বিকাশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে অনলাইন গেমস পাবজি ফ্রি ফায়ার ইত্যাদির কারণে। মোবাইল ডিভাইস ও ইন্টারনেট সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় এবং স্কুল-কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় লাখ লাখ শিশু কিশোর অনলাইন গেমসে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মানসিক বিকাশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে, এমনকি অনলাইন গেমসের জের ধরে খুন-খারাবির মত ঘটনাও ঘটছে। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশ জারি করেছিল পাবজি ফ্রি ফায়ারসহ ক্ষতিকর গেমসগুলো বাংলাদেশে বন্ধ করার। কিন্তু সেটাও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে। সরকারিভাবে পাবজি, ফ্রি ফায়ার বন্ধ করলেও বিকল্প পদ্ধতিতে শিশু কিশোররা গেমসগুলো চালিয়ে যেতে পারছে সহজেই।

- **অনলাইন গেমসের আসক্তি ভয়াবহ পর্যায়ে**

আসক্তি বলতে বোঝায় সাময়িক প্রশান্তির জন্য মানুষ বারবার যার দ্বারস্থ হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে তার ভেতরে সেটার জন্য আবারও চাহিদা তৈরি হয়। আসক্তি বহুরকম হতে পারে- যেমন যৌনতা, জুয়া, শপিং, ইন্টারনেটে গেমস খেলা, মাদক ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের মতে- ইন্টারনেটে পাবজি, ফ্রি ফায়ারসহ বহু গেমসের প্রতি শিশু কিশোররা আসক্ত হয়ে পড়ছে, যা মাদকাসক্তির মতই তরুণ সমাজকে বিপথে চালিত করার হুমকি তৈরি করেছে।

এমনকি পাবজি, ফ্রি-ফায়ার ইত্যাদি গেমসের কারণে খুনের ঘটনাও ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এই অনলাইন গেমগুলো এখন প্রায় মাদক দ্রব্যের মতো কাজ করছে। অনেকে এগুলোকে 'ডিটিজাল ড্রাগস' আখ্যা দিচ্ছেন। লাখ লাখ ছেলে মেয়ে এসব গেমসে আসক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

গত দু'মাসে অনলাইনে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে বহু অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনা পত্রিকায় এসেছে, যা চিন্তাশীল মহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। যেমন, পাবজি গেম খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে নবম শ্রেণির ছাত্র খুন হবার ঘটনা কিংবা পাবজি গেম খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে বন্ধুর বাবাকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিদেশেও এই গেম ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছে।

গত ২৯ আগস্ট ভারতের পাঞ্জাবে পাবজি খেলার নেশায় বাবা-মায়ের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৬ লক্ষ টাকা

খরচ করেছে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোর। লকডাউনে অনলাইন ক্লাস করবে বলে মায়ের মোবাইল ব্যবহার করত সে। স্মার্টফোনে কার্ড ও ব্যাংক ডিটেইলস সেভ থাকায় টাকা তুলতে সমস্যা হয়নি তার। অথচ সেই টাকাটি তার বাবার চিকিৎসার জন্য রাখা হয়েছিল। এছাড়া সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভারতের মধ্যপ্রদেশের একটি ঘটনাও সবার দৃষ্টি কেড়েছে। মধ্যেপ্রদেশের ছাতারপুর জেলায় মোবাইলে অনলাইনে গেমস খেলে ৪০ হাজার টাকা খুইয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ১৩ বছর বয়সী এক কিশোর। মোবাইলের একাউন্ট থেকে টাকা নেওয়ার মেসেজ পেয়ে ছেলেকে ফোন করে বকাবকি করেন কিশোরের মা। যা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে ওই কিশোর।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে এসব অনলাইন গেমসের আসক্তি কতটা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। কোমলমতি ছেলে মেয়েদেরকে এসব অনলাইন গেমস এমন এক নেশার জগতে নিয়ে গিয়েছে যেখানে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা তাদের থাকছে না।

২০০৮ সালের জুন মাসে শিশু-কিশোরদের এই সমস্যার উপর দীর্ঘদিন জরিপ করে বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা গেমিং অ্যাডিকশনকে মনঃস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অনেকে বলছেন এটা একটা মানসিক রোগে পরিণত হয়েছে। ইদানীং দেখা যায় গেমস আসক্তির ফলে তাদের মাথা ব্যথা এবং কম বয়সেই চোখের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমনকি গেমিংয়ের শিকার হচ্ছে ৩-৪ বছরের শিশুরাও। তাদের হাতে মোবাইল না দিলে হিংসাত্মক হয়ে উঠছে তাদের স্বভাব।

• অনলাইন গেমস যেসব সমস্যা ডেকে এনেছে

১. অনলাইন গেমসে আসক্তির ফলে বাবা মায়ের সাথে শিশু কিশোরদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
২. শিশু কিশোররা বাবা মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গেমস খেলছে। মিথ্যা বলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩. ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় খাবার গ্রহণ অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু কিশোররা।
৪. রাত জেগে মোবাইলের স্ক্রিনে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে এবং সেটার খারাপ প্রভাব পড়ছে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর।
৫. পড়ালেখায় মনোযোগ আসছে না।
৬. স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গল্প, কবিতা, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়ার অভ্যাস তৈরি হচ্ছে না ছাত্র-ছাত্রীদের।
৭. বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে আইনি ঝামেলায় পড়ে যাচ্ছে অনেকে।
৮. পাবজি, ফ্রি ফায়ারসহ বিভিন্ন অনলাইন গেমস শিশু কিশোরদের মধ্যে এক ধরনের আগ্রাসী ও হিংস্র মনোভাব সৃষ্টি করে দিচ্ছে।
৯. গেমের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা নিজের অজান্তেই বিভিন্ন ধরনের অপরাধের কায়দা-কৌশল শিখছে।
১০. সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হচ্ছে তাহলো- শিশু কিশোররা শৈশবের দুরন্তপনা, খেলাধূলা, ছোটাছুটি ইত্যাদি স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অপ্রাকৃতিক ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

অনলাইন গেমসে আসক্ত হয়ে পড়ছে শিশু-কিশোররা। (ছবি: ইন্টারনেট)

• সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে

পাবজি, ফ্রি ফায়ারসহ ক্ষতিকর অনলাইন গেমস বন্ধের তাগিদ অনুভব করে রাষ্ট্রীয়ভাবেও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ আছে।

গত ২৪ জুন দেশীয় সব অনলাইন প্ল্যাটফর্মে টিকটক, বিগোলাইভ, লাইকি, পাবজি এবং ফ্রি ফায়ারের মত গেমস ও অ্যাপসগুলো বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হুমায়ুন কবির পল্লব ও মোহাম্মদ কাউছার। এরপর গত ১৬ই আগস্ট বাংলাদেশে সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে পাবজি, ফ্রি ফায়ারসহ ক্ষতিকর সব অনলাইন গেমস আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি দেশে অনলাইন গেমস পাবজি ও ফ্রি ফায়ার বন্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও শিশু কিশোররা আগের মতই পাবজি ও ফ্রি ফায়ার খেলতে পারছে এমনটা জানা গেছে। অনেকে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) ব্যবহার করে

গেমগুলো খেলতে পারছে, আবার অনেকে ভিপিএন ছাড়াই আগের মতই গেমগুলো খেলতে পারছে, এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে।

• তাহলে সমাধান কী?

ক্ষতিকর অনলাইন গেমস ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তরুণদের জড়িত হওয়ার হার বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি বিষয়ে খুব জোর দিচ্ছেন। তারা বলছেন-

১. ডিভাইসের আসক্তি থেকে বের করার জন্য শিশু কিশোরদেরকে বাস্তব জীবনে খেলাধূলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। খেলাধূলাকে ঐচ্ছিক বা অপ্রয়োজনীয় বিষয় মনে করা চলবে না। খেলাধূলাকেও লেখাপড়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে দেখতে হবে। একটা সময় ছিল যখন তরুণরা কাবাডি, ফুটবল, ক্রিকেট, মোরগ লড়াই ইত্যাদি খেলায় মেতে থাকত। মেয়েদের বৌচি, কানামাছি, পুতুল বৌ, ফুল টোক্কা, বরফ পানি, এক্কা দোক্কা, রুমাল চুরি, রস কস, চার গুটি, চেয়ার খেরা সহ আরো কত খেলাধুলার নাম পাওয়া যায় যেগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এসব খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করলে শারীরিকভাবে তো বটেই, মানসিকভাবে ও সামাজিকভাবেও শিশু কিশোররা প্রভূত উপকার পেতে পারে। যেমন- একদল ছেলে মেয়ে যখন একসাথে খেলবে তখন সেখানে একে অপরের সাথে চেনা-পরিচয় তৈরি হবে, সামাজিক মেলামেশার জন্য যেসব গুণ দরকার হয় সেগুলো তাদের চরিত্রে তৈরি হবে, বন্ধুত্ব তৈরি হবে, একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে, সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের শিক্ষা তারা অবচেতন মনেই পেয়ে যাবে। তাছাড়া সরাসরি খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করলে সাহস বৃদ্ধি পায়, কথা বলারও যোগ্যতা তৈরি হয়। সবার সাথে মেলামেশা করার দক্ষতা এভাবেই একটি শিশুর মধ্যে কোমল বয়সেই তৈরি হয়ে যায়।

২. দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে সরকারকে। যদি সত্যিই দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বখে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তাহলে এখনই শিশু কিশোরদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খেলাধূলাকে শিক্ষার মতই গুরুত্ব দিতে হবে। খেলার মাঠগুলো দখলমুক্ত করতে হবে সবার আগে। নতুন নতুন খেলার মাঠ তৈরি করে দিতে হবে ছেলে মেয়েদের জন্য। আর শিক্ষাব্যবস্থাকেও এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার জন্য সময় দিতে পারে। এই যে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগী হয়ে অনলাইন ও অফলাইনের বিভিন্ন ক্ষতিকর বিষয়ে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এটাকে কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। এতে বোঝা যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শিশু কিশোরদের সামনে বড় কোনো লক্ষ্য হাজির করতে পারছে না। মহৎ কোনো উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছে না, যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ছেলে মেয়েরা এদিক ওদিক মনোযোগ না দিয়ে একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে।

৩. তবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা অভিভাবকদেরকে পালন করতে হবে। সন্তানের প্রতি অভিভাবকের দায়িত্ব অনেক। ইদানীং দেখা যায় ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখাকেই অভিভাবকরা একমাত্র দায়িত্ব বলে মনে করেন। ভালো ফলাফল বা ভালো কলেজ-ভার্সিটিতে ভর্তির জন্য সবসময় একটা বাড়তি চাপের মধ্যে ছেলে মেয়েদেরকে ফেলে রাখা হয়, অথচ সবার আগে বিবেচনা করা দরকার শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি যাতে ঠিকমত হয়। তার জন্য সর্বপ্রথম শিশু-কিশোরদেরকে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। তাদেরকে খেলাধূলা, ভ্রমণ, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা, গান-কবিতা-অভিনয়-লেখালেখি-অঙ্কন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে শিশু-কিশোররা হলো অনুকরণ-প্রবণ। অনেক বাবা-মা সারাদিন বাসার বাইরে থেকে বা অফিস থেকে বাসায় ফিরেই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, বা টিভিতে সিরিয়াল দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটা সন্তানদের একাকীত্ব বাড়িয়ে তোলে এবং এক পর্যায়ে সে তার নিঃসঙ্গতা ঘোঁচানোর জন্য ডিভাইসকেই বন্ধু বানিয়ে ফেলে, যা পরবর্তীতে আসক্তির পর্যায়ে চলে যায়।

বিশেষ প্রতিবেদন

এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

এ কোন সমাজে বাস করছি আমরা? মানুষ কেন এত হিংস্র হয়ে উঠছে? কেন সমাজ থেকে দয়া-মমতা জিনিসটা উঠে যাচ্ছে? যে মানুষ নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে গর্ব করে, সেই মানুষ কেন পশুর চেয়েও নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করছে নির্বিকারভাবে?

এই প্রতিবেদন লেখার সপ্তাহেই কমপক্ষে দশটি খুন/ধর্ষণের ঘটনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে ঘটনাগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, সন্তান বাবা-মাকে হত্যা করেছে, বাবা মা সন্তানকে হত্যা করেছে, স্বামী তার স্ত্রী/সন্তানকে হত্যা করেছে, বাবা তার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে- এ যেন কোনো মানুষের সমাজের চিত্র নয়, বরং ভয়াবহ এক নরকের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে পত্রিকার পাতায় পাতায়। এই অবস্থা প্রমাণ করে হিংস্রতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আমাদের সমাজ।

গত ৩১ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে এক গৃহবধূ ও তার দেড় বছর বয়সী শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যাত্রাবাড়ী থানার এসআই হুমায়ুন কবির বলেন, ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী অহিদ তার স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যা করেছে।

একই দিন পুলিশ কক্সবাজারের উখিয়ায় এক দম্পতিকে গ্রেফতার করে, যাদের কর্মকাণ্ড জেনে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাদের পৈশাচিকতা পিশাচকেও হার মানিয়ে দেয়। সৎ বাবা ও আপন মা মিলে চার বছরের শিশুকে পৈশাচিক নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে পুলিশ জানায়। শিশুটির সৎ বাবা ও মা প্রায় দুই মাস ধরে শিশুটিকে বিভিন্ন সময়ে অমানবিক নির্যাতন করত। কখনো প্লাস্টিকের রশি দিয়ে ঘরের চালের তীরের সঙ্গে উল্টো করে ঝুলিয়ে, কখনো মাথায় আঘাত করে, কখনো গালে কামড় বসিয়ে আবার কখনো বা পেটে-পিঠে ঘুষি মেরে চালানো হত অমানবিক পৈশাচিক নির্যাতন। অসহনীয় ব্যথায় শিশুটির চিৎকারেও ঘাতক বাবা নুরুল হক কিংবা মা বুলবুল আক্তারের মন গলেনি। তাদের পাশবিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে মারা যায় সুমাইয়া আক্তার। এরপর শিশুটিকে ঘরের মেঝেতে পাটির উপর শুইয়ে কম্বল চাপা দিয়ে ঘর তালাবদ্ধ করে ঘাতক বাবা ও মা পালিয়ে যায়। একজন মা কীভাবে তার অবুঝ সন্তানকে হত্যা করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য হয়ত কারো নেই।

এদিকে গত ৩ সেপ্টেম্বর তিনটি নৃশংস ঘটনা পত্রিকার পাতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়, যে ঘটনাগুলো শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রথম ঘটনাটি নড়াইলের। বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে দিতে রাজি না হওয়ায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ ওঠে পাষণ্ড স্বামী রকিবুলের বিরুদ্ধে। একই দিন মাদারীপুরের কালকিনিতে বড় ভাইকে হত্যার অভিযোগে ছোট ভাই কালাম বেপারীসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে যশোরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাচাতো ভাইয়ের হাতে খুন হন ইমামুল আলম নামের এক ব্যক্তি।

এরপর গত ৫ সেপ্টেম্বর আরও তিনটি পৈশাচিক ঘটনার খবর গণমাধ্যমের পাতায় শিরোনাম হয়। বর্বরোচিত এই ঘটনাগুলো হলো- যশোরের ঝিকরগাছায় পরকিয়ার জেরে স্ত্রী ও ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, নেশার টাকা না পেয়ে ছেলের হাতে বাবা খুন, এবং চাচাকে গালাগালির প্রতিবাদ করায় বাবাকে খুন। খেয়াল করে দেখুন কে খুন করছে, কাকে খুন করছে, কেন খুন করছে!

যখন কোনো ভাই তার ভাইয়ের হাতে নিরাপদ থাকে না, কন্যা তার পিতার কাছে নিরাপদ থাকে না, পিতা তার সন্তানের কাছে নিরাপদ থাকে না, স্বামী তার স্ত্রীর কাছে নিরাপদ থাকে না, সন্তান তার মায়ের কাছে নিরাপদ থাকে না- তখন সেই সমাজে দ্রুতই হতাশা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হিংস্রতা ও পাশবিকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং দিনকে দিন তা লাগামহীনভাবে বাড়তেই থাকে। এভাবেই একটি সমাজ ধ্বংস হয়, জাতি ব্যর্থ হয়, সভ্যতার পতন ঘটে।

এগুলো কি শুধুই একেকটি সংবাদের শিরোনাম? নাকি একটি সমাজের ধ্বংসের আলামত? কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের পারিবারিক বন্ধন? কোথায় হারিয়ে গেল পবিত্রতম ভালোবাসার সম্পর্কগুলো?

হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু কেন সে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল সে প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি যা বর্ণনা দেয় তা জানার পর কোনো সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ স্থির থাকতে পারে না। মেয়েটি জানায় তার বাবার অপকীর্তির কথা। মেয়েটিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে প্রায়ই ধর্ষণ করা হত, আর তা করত আপন জন্মদাতা পিতা। এই কথা মেয়েটি কারো কাছে বলতেও পারত না, মেনেও নিতে পারত না। এক পর্যায়ে সে আত্মহত্যা করার পথ বেছে নেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের পাল্লা ভারি হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অপরাধ বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, সংঘাত ইত্যাদি লেগেই আছে। আমাদের দেশেও এসমস্ত অপরাধ তুঙ্গে। এই অবস্থায় পরিবারই মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ অবলম্বন হয়ে টিকে ছিল এতদিন। এক ভাই আরেক ভাইয়ের সাহস বাড়াত, পিতার আশীর্বাদের হাত পুত্রের মনে ভরসা যোগাতো, মা বাবা ভাই বোন চাচা দাদা সবাই মিলে একে অপরের বিপদে আপদে হাসি আনন্দে সাধে আহ্লাদে এগিয়ে আসত। এই পারিবারিক সম্পর্কগুলো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও মমতায় ঘেরা এমন এক নিরাপদ শান্তির বলয় তৈরি করে দিত যা কখনও টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু

বাবা কর্তৃক মেয়ে ধর্ষিত হবার ঘটনাও ঘটছে। (প্রতীকী ছবি)

না, এখানেই শেষ নয়। আমাদের সমাজের ঘৃণ্য বাস্তবতার আরেক রোমহর্ষক দৃশ্য এখনও বাকি আছে। গত ৫ আগস্টের ঘটনা। ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় একটি মেয়ে বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে

সেই সুন্দরতম সম্পর্কগুলোও আজ স্বার্থপরতা ও হিংস্রতার থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠছে কেন তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

যখন কোনো ভাই তার ভাইয়ের হাতে নিরাপদ থাকে না, কন্যা তার পিতার কাছে নিরাপদ থাকে না, পিতা তার সন্তানের কাছে নিরাপদ থাকে না, স্বামী তার স্ত্রীর কাছে নিরাপদ থাকে না, সন্তান তার মায়ের কাছে নিরাপদ থাকে না- তখন সেই সমাজে দ্রুতই হতাশা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হিংস্রতা ও পাশবিকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং দিনকে দিন তা লাগামহীনভাবে বাড়তেই থাকে। এভাবেই একটি সমাজ ধ্বংস হয়, জাতি ব্যর্থ হয়, সভ্যতার পতন ঘটে।

মানুষের দেহ ছাড়াও আত্মা আছে, ইহকালের পর পরকালও আছে। সেই আত্মা ও পরকাল ভুলে গিয়ে মানুষকে এমন এক মরীচিকার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যেখানে মানুষ সবকিছু পেতে গিয়ে সবকিছুই হারিয়ে ফেলছে। সামান্য ইন্দ্রীয়-সম্ভোগ বা বৈষয়িক স্বার্থের পেছনে দৌড়তে গিয়ে পবিত্র সম্পর্কগুলো অকাতরে নষ্ট করে দিচ্ছে। তারপর একুল ওকুল দুকুলই হারাচ্ছে। কারণ এই বস্তুবাদী জীবনদর্শন মানুষের সামনে অসীম চাহিদা ও অসীম ক্ষুধা সৃষ্টি করে দেয়, যে ক্ষুধা কোনোদিনই মিটবে না। সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পেয়ে গেলেও সে ক্ষুধার্তই থাকবে, তার চাই চাই ফুরাবে না। আর সুখ ও শান্তি নামক সোনার হরিণটাও সে কোনোদিন খুঁজে পাবে না।

মানুষের ইতিহাস ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এই ইতিহাস পরিক্রমায় এমন সময় এসেছে যখন সমাজে ন্যায়ের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, মানবিক গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ চরিত্রের মানুষের প্রচেষ্টায় সমাজ হয়েছে আলোকিত। আবার কখনও এমন সময় এসেছে সমাজে অন্যায় ও অসত্যের জয় হয়েছে, অধিকাংশ মানুষ হয়ে উঠেছে পাশবিক চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু তারপরও বলতে হয়- আজ একবিংশ শতাব্দীর মানুষ নৈতিক চরিত্র হারাতে হারাতে যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। অতীতে কখনও মানুষ এতটা পাশবিক হতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়।

এই অবস্থার কারণ হিসেবে অনেক বিশ্লেষক দায়ী করছেন প্রচলিত ভোগবাদী ও বস্তুবাদী জীবনদর্শনকে। এই বস্তুবাদী জীবনদর্শন মানুষকে কেবল জীবনের একটি দিক শেখায়- দেহের দিক, বস্তুর দিক, ভোগের দিক, ইহকালের দিক। কিন্তু জীবনের অন্যদিকটি অবহেলায় অনাদরে পড়ে থাকে।

মানুষের দেহ ছাড়াও আত্মা আছে, ইহকালের পর পরকালও আছে। সেই আত্মা ও পরকাল ভুলে গিয়ে মানুষকে এমন এক মরীচিকার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যেখানে মানুষ সবকিছু পেতে গিয়ে সবকিছুই হারিয়ে ফেলছে। সামান্য ইন্দ্রীয়-সম্ভোগ বা বৈষয়িক স্বার্থের পেছনে দৌড়তে গিয়ে পবিত্র সম্পর্কগুলো অকাতরে নষ্ট করে দিচ্ছে। তারপর একুল ওকুল দুকুলই হারাচ্ছে। কারণ এই বস্তুবাদী জীবনদর্শন মানুষের সামনে অসীম চাহিদা ও অসীম ক্ষুধা সৃষ্টি করে দেয়, যে ক্ষুধা কোনোদিনই মিটবে না। সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পেয়ে গেলেও সে ক্ষুধার্তই থাকবে, তার চাই চাই ফুরাবে না। আর সুখ ও শান্তি নামক সোনার হরিণটাও সে কোনোদিন খুঁজে পাবে না।

এই ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে দিনশেষে আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছুই দিতে সক্ষম নয়- কিন্তু সেটা বোঝার আগেই মানুষ তার দেশ, সমাজ, পরিবার এমনকি নিজের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলছে, যার আশু সমাধান খুঁজে বের করা সময়ের দাবি নয় কেবল, মানবজাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

মানব কল্যাণই ইসলামের উদ্দেশ্য

সমাজে শান্তি স্থাপনের নামই ইসলাম।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন,
আমাদের ফেইসবুক পেজে–

/SYSTEMPALTAI

সরাসরি স্ক্যান করে ভিজিট করুন

১১ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন

৯/১১ হামলার বিশ বছর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফল কী হলো?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

৯/১১ হামলা। (ছবি: ইন্টারনেট)

২০০১ সালের আজকের এই দিনে পরাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ঘটে যায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা, যা ৯/১১ হামলা নামে খ্যাত। প্রায় ৩০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ওই হামলায়। হামলার জন্য অভিযুক্ত করা হয় আন্তর্জাতিক সশস্ত্র গোষ্ঠী আল কায়েদাকে।

• হামলার পটভূমি

আল কায়েদার উত্থানের জন্য অনেক বিশ্লেষক যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করে থাকেন। কেননা গত শতাব্দীর আশির দশকে আফগানিস্তানে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক আগ্রাসন চালালে যুক্তরাষ্ট্রই তখন আল কায়েদার মত গোষ্ঠীকে অর্থ, অস্ত্র ও অন্যান্য সমর্থন দিয়ে সহায়তা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ওই যুদ্ধকে জেহাদ হিসেবে প্রচার করাটাও যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৌশল ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ওই দফায় যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাশ হতে হয়নি, কারণ সত্যিই আল কায়েদাসহ বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর তথাকথিত "মুজাহিদিনরা" আফগানিস্তানে এক দশকের যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো- যে কাঁটা দিয়ে সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘায়েল করেছে সেই কাঁটা পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের শরীরে বিঁধতে শুরু করেছিল। আল কায়েদার মত সশস্ত্র সংগঠনগুলো আফগানিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সারা বিশ্বে তথাকথিত জিহাদী নেটওয়ার্ক তৈরি করে দেশে দেশে জিহাদ রপ্তানী করা শুরু করে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রকেও শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করে আল কায়েদা।

> ***৯/১১ এর সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ডাব্লিউ বুশ। তিনি এই হামলার জবাবে এমন এক যুদ্ধে সারা বিশ্বকে জড়িয়ে ফেলেন, যা গত ২০ বছর ধরে চলছে। তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন- 'আমাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আল কায়েদাকে দিয়ে শুরু। কিন্তু তা এখানেই শেষ হবে না।'***

আল কায়েদা কেন যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল তার ব্যাখ্যা দিয়ে ২০০২ সালের নভেম্বরে তৎকালীন আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন 'লেটার টু আমেরিকা'তে যে যুক্তি দেখান তার অন্যতম হলো- ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন, সোমালিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন, মরো সংঘর্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনকে সমর্থন, লেবাননে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে ইসরায়েলকে সমর্থন, চেচনিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রে রুশদের সমর্থন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে প্রো-মার্কিন সরকার, কাশ্মীরে ভারতকে সমর্থন, সৌদি আরবের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ইত্যাদি। (তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া)

এসব কারণে আল কায়েদার কথিত জেহাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় যুক্তরাষ্ট্র। আর তারই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আল কায়েদা ৯/১১ এর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

• এক নজরে ৯/১১ হামলা

দিনটি ছিল ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। হামলাকারীদের লক্ষ্য ছিল যাত্রীবাহী চারটি বিমান ছিনতাই করে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আছড়ে ফেলা। ছিনতাইকারীরা ছোট ছোট দলে পূর্ব আমেরিকার আকাশপথ দিয়ে ওড়া চারটি বিমান একইসাথে ছিনতাই করে। তারপর বিমানগুলি তারা ব্যবহার করে নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ ভবনে আঘাত হানার জন্য বিশাল ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে। দুটি বিমান বিধ্বস্ত করা হয় নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ভবনে।

তৃতীয় বিমানটি পেন্টাগনের সদর দপ্তরের পশ্চিম অংশে আঘাত হানে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটে। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির উপকণ্ঠে ছিল আমেরিকান প্রতিরক্ষা বিভাগের বিশাল এই সদর দপ্তর পেন্টাগন ভবন। এরপর, সকাল ১০টা ৩ মিনিটে চতুর্থ বিমানটি আছড়ে পড়ে পেনসিলভেনিয়ার এক মাঠে। ছিনতাই হওয়া চতুর্থ বিমানের যাত্রীরা ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পর সেটি পেনসিলভেনিয়ায় বিধ্বস্ত হয়। ধারণা করা হয় ছিনতাইকারীরা চতুর্থ বিমানটি দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল ভবনের ওপর আঘাত হানতে চেয়েছিল। এসব হামলায় সব মিলিয়ে মারা গিয়েছিল ২,৯৭৭ জন। এই হিসাবের মধ্যে ১৯ জন ছিনতাইকারী অন্তর্ভুক্ত নেই। নিহতদের বেশিরভাগই ছিল নিউইয়র্কের লোক।

৯/১১ এর সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ডাব্লিউ বুশ। তিনি এই হামলার জবাবে এমন এক যুদ্ধে সারা বিশ্বকে জড়িয়ে ফেলেন, যা গত ২০ বছর ধরে চলছে। তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে

প্রথম বিমানটি আঘাত হানে নর্থ টাওয়ারে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলীয় সময় সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটে। দ্বিতীয় বিমানটি সাউথ টাওয়ারে বিধ্বস্ত করা হয় এর অল্পক্ষণ পর, সকাল ৯টা ৩ মিনিটে। দুটি ভবনেই আগুন ধরে যায়। ভবন দুটির উপরতলায় মানুষজন আটকা পড়ে যায়। শহরের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দুটি টাওয়ার ভবনই ছিল ১১০ তলা। মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে দুটি ভবনই বিশাল ধুলার ঝড় তুলে মাটিতে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে।

যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন- 'আমাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আল কায়েদাকে দিয়ে শুরু। কিন্তু তা এখানেই শেষ হবে না।'

• ২০ বছরের যুদ্ধের ফলাফল কী?

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ৯/১১ এর হামলাটি নিঃসন্দেহে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। নির্বিচারে বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যা কোনো সুস্থ চিন্তার মানুষ করতে পারে না। পৃথিবীর কোনো আইন বা ধর্মীয় বিধান এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে না। স্বভাবতই, এই হামলার বিরুদ্ধে দেশে দেশে নিন্দার ঝড় ওঠে।

কিন্তু বিশ্লেষকদের ধারণা- যুক্তরাষ্ট্র দেশ-বিদেশের কোটি কোটি মানুষের সেই সহানুভূতি ধরে রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে, আফগানিস্তান ও ইরাকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে তাকেও "সন্ত্রাসী আচরণ" হিসেবে অনেকে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

> ***পরিহাসের বিষয় হলো- ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যেখান থেকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু করেছিল, আফগানিস্তান এখন সেখানেই ফেরত গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহার কার্যক্রম শেষ হবার আগেই তালেবানরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। যে তালেবান যোদ্ধারা গত ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের দৃষ্টিতে "সন্ত্রাসী" "জঙ্গি" বলে অভিহিত হয়েছে, তারাই এখন আফগানিস্তানের সরকার গঠন করছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিলেও দিতে পারে!***

হামলার প্রতিশোধ নিতে যুক্তরাষ্ট্র শুরু করে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ২০০১ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ দিয়ে সেই যুদ্ধের শুরু হলেও কেউ জানত না সেই যুদ্ধের শেষ কোথায় গিয়ে ঠেকবে। যুদ্ধের ছিল না কোনো সুনির্দিষ্ট সীমানা, ছিল না কোনো সুনির্দিষ্ট শত্রুও। এ এমন এক যুদ্ধ- যা কেবল কথিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ বেসামরিক মানুষ। যুদ্ধের সাথে জড়িত নয় এমন নারী, শিশু ও বেসামরিক মানুষের প্রাণহানির পরিমাণ এত বেশি যে, যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকতে পারেনি। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের শুধু ইরাক দখলের পরিণতিতেই অন্তত দশ লক্ষ ইরাকী প্রাণ হারিয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক মানুষ। শুধু তাই নয়, সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর সেই ইরাকেই আন্তর্জাতিক সশস্ত্র গোষ্ঠী আইএসের উত্থান হয়, যাদেরকে দমনের নামে আবারও যুক্তরাষ্ট্র বিমান হামলা শুরু করে এবং আবারও হাজার হাজার নির্দোষ মানুষ মারা যায়। উদ্বাস্তু হয় লক্ষ লক্ষ ইরাকী। এখানেও আইএসের উত্থানের নেপথ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ দায় আছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে আফগানিস্তানেও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসন ও পরবর্তীতে বিশ বছর ধরে চলা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের হাতে হাজার হাজার নির্দোষ আফগান প্রাণ হারিয়েছে। হাজার হাজার শিশু এতিম হয়েছে, নারীরা বিধবা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলা নিয়ে বহুবার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে দেশটিকে। আফগানিস্তান ছাড়াও পাকিস্তানের তালেবান অধ্যুষিত এলাকাতে ড্রোন হামলা চালিয়ে বহু নির্দোষ মানুষকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যদিও যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে আসছে তাদের ড্রোন হামলাগুলো কেবল জঙ্গি ঘাঁটিকে টার্গেট করে হয়ে থাকে।

সর্বশেষ আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা চলে যাবার একদিন আগে গত ২৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় আফগানিস্তানের কাবুলে একটি নির্দোষ পরিবারের ১০ সদস্য নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭জনই ছিল শিশু। এভাবেই বছরের পর বছর কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের মাশুল দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মানুষকে নির্বিচারে জীবন দেওয়ার মাধ্যমে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের খেসারত হিসেবে নির্দোষ মানুষের প্রাণ ঝরেছে!

এমনকি এই যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বারবার। অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইটা যতটা না সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে, তারচেয়ে অনেক বেশি ভূরাজনৈতিক স্বার্থ ও তেল-গ্যাসনির্ভর অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। এ ধরনের অভিযোগ ওঠার পেছনে শক্ত যুক্তি-প্রমাণও আছে। কেননা যুক্তরাষ্ট্র বেছে বেছে কেবল ওইসব দেশকেই টার্গেট করছিল যারা যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ্য হয়েছিল। যেমন আফগানিস্তান, ইরাক ইত্যাদি। ইরাক দখলের পর বিষয়টি অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ২০০৩ সালে কোনো শক্ত তথ্য-প্রমাণ ছাড়া ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে আক্রমণ চালায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে উৎখাত করে। এরপর দশকের পর দশক ইরাকে গৃহযুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি চলতে থাকে। পক্ষান্তরে এমন কিছু রাষ্ট্র ছিল প্রত্যক্ষভাবে উগ্রবাদ বিস্তারে ইন্ধন যোগালেও ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করলেও যুক্তরাষ্ট্র ওইসব দেশে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। কেননা, ওইসব দেশের সরকার যুক্তরাষ্ট্রের তল্পিবাহক।

যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শেষ হয়েছে এমন ঘোষণা এখনও দেশটির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। তবে এ যুদ্ধের পরিসর সীমিত হয়ে আসছে ক্রমশই। পরিহাসের বিষয় হলো- ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যেখান থেকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু করেছিল, আফগানিস্তান এখন সেখানেই ফেরত গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনা

প্রত্যাহার কার্যক্রম শেষ হবার আগেই তালেবানরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। যে তালেবান যোদ্ধারা গত ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের দৃষ্টিতে "সন্ত্রাসী" "জঙ্গি" বলে অভিহিত হয়েছে, তারাই এখন আফগানিস্তানের সরকার গঠন করছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিলেও দিতে পারে!

বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র যা চেয়েছিল সেটা ঠিকই আদায় করে নিয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ও আফগানিস্তানের দখলদারিত্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর লাভবান হয়েছে, এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ-সহিংসতার প্রসার ঘটিয়ে অস্ত্রব্যবসার বাজারও জমিয়েছে ভালোই। এটাই যদি যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে দেশটি যে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ বিশ বছরের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ করে আফগানিস্তানের কোনোকিছুই পরিবর্তন করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমত- তালেবান আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, দ্বিতীয়ত- আল কায়েদার নেটওয়ার্ক এখন আরও সম্প্রসারিত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং তৃতীয়ত- নতুন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আফগানিস্তানের আইএসকেপি উগ্রগোষ্ঠী। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্জন কী? এত প্রাণহানি করে কী লাভ হলো?

বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র যা চেয়েছিল সেটা ঠিকই আদায় করে নিয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ও আফগানিস্তানের দখলদারিত্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর লাভবান হয়েছে, এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ-সহিংসতার প্রসার ঘটিয়ে অস্ত্রব্যবসার বাজারও জমিয়েছে ভালোই। এটাই যদি যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে দেশটি যে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

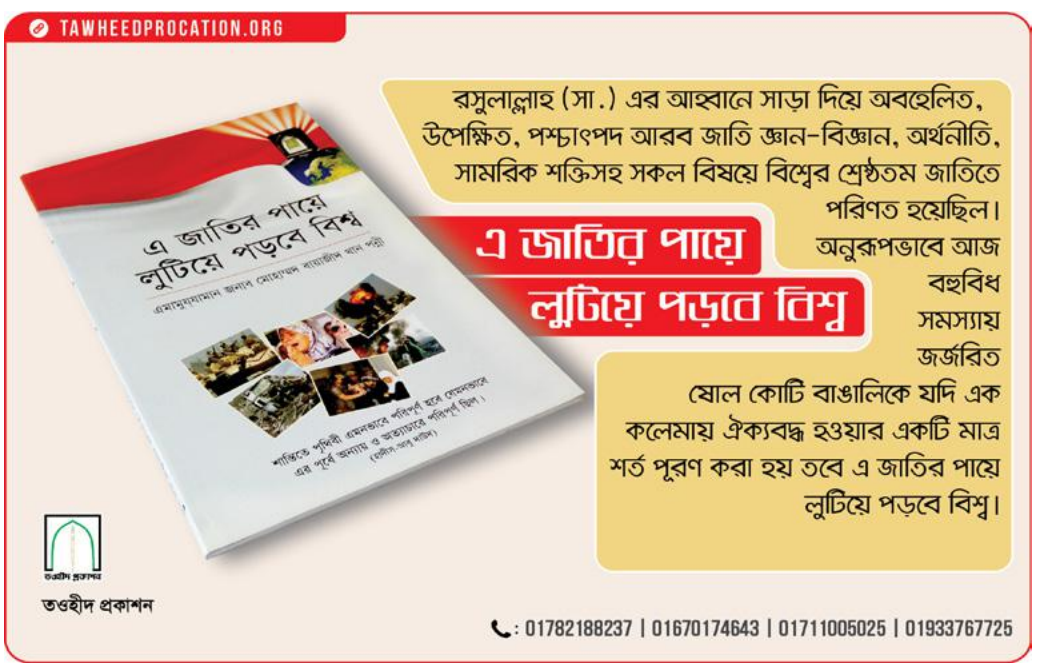

ইসলামে নারীশিক্ষা

শাকিলা আলম

আফগান নারীদের কাছে সন্তান প্রসব এখন 'আতঙ্ক'। (ছবি: ইন্টারনেট)

আমাদের আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ - ইসলামে নারীশিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি সভ্য হতে পারে না। ইসলাম এসেছে মানবজাতিকে সভ্যতা উপহার দিতে, তাই ইসলামে নারী ও পুরুষ সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক। রসুলাল্লাহ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ (ইবনে মাজাহ)। এমনও বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে যদি আরব থেকে সুদূর চীনদেশেও যেতে হয়- যাও।

বাবা আদমকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাঁকে এই বিশ্বজাহানের সকল বস্তুর নাম অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন (সুরা বাকারা ৩১)। যার দরুন তিনি অন্যান্য সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হলেন। সকল মালায়েক তাঁকে সেজদা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিল, তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকার ঘোষণা করল। আল্লাহ আদম (আ.)-কে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, সেই জ্ঞান কেয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তানদের গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। সেই প্রথম মানুষ থেকে হাজার হাজার বছর পেরিয়ে মানবজাতি নানা সভ্যতার ধাপ অতিক্রম করে আজ যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, এ সবই সম্ভব হয়েছে জ্ঞানের বিস্তারের মাধ্যমে। মানুষ তার উদ্ভাবিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম সেই জ্ঞানকে আরো বৃদ্ধি করে তুলে দিয়ে গেছে তার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীই সেটা করতে পারে নি। তাই হাজার হাজার বছর ধরে তারা একই জীবনযাপন করে চলেছে।

আল্লাহর রসুল ছিলেন জীবন্ত কোর'আন, জীবন্ত ইসলাম। আজ আমরা যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষাটি লাভ করতে চাই, আমাদেরকে দেখতে হবে যে আল্লাহ কোর'আনে কী বলেছেন এবং রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর হাতে গড়া উম্মাহ আল্লাহর কোন হুকুমের চর্চা কীভাবে করেছেন। তাঁদের চলে যাওয়ার কয়েক শতাব্দী পরে দীনের প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করা হয়েছে। সেগুলো যদি রসুলাল্লাহ ও তাঁর আসহাবদের আমলের

সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে সেগুলোকে গ্রহণ করা যাবে না। এবার আসা যাক মূল প্রসঙ্গে।

• সর্ব অঙ্গনে নারীর অংগ্রহণের অধিকার

আল্লাহর রসুল (সা.) কে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর হুকুম দিয়ে শাসন করার জন্য; এ লক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদভিত্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই অতি বৃহৎ কাজটি করতে হলে এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আপ্রাণ প্রচেষ্টা বা জেহাদ করতে হবে। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে একটি জাতি কখনোই অগ্রসর হতে পারবে না, এটা সাধারণ জ্ঞান। তাই আল্লাহর রসুল ইসলামে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনোরকম ভেদাভেদ করেন নি। নারী ও পুরুষ উভয়কেই তিনি মানুষ হিসাবে দেখেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে যে মহা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেটা পালন করার ক্ষেত্রে তারা যেন তাঁকে সহযোগিতা করতে পারেন, এজন্য উভয়কেই সকল অঙ্গনে কাজ করার জায়গা, সুযোগ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। নারীদেরকে বুদ্ধিহীন, দুর্বল ইত্যাদি বলে অবজ্ঞা করেন নি। ফলে অনেক নারী সাহাবিই তাদের নিজেদের মধ্যে থাকা সম্ভাবনাকে বিকশিত করে জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মদিনার প্রথম হাসপাতালটির অধ্যক্ষ ছিলেন একজন নারী সাহাবি রুফায়দাহ আসলামিয়া (রা.)। শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.) আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে এতটাই জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, ওমর (রা.) তাকে ইসলামী আদালতের 'ক্বাজাউল হাসাবাহ' (Accountability court) অর্থাৎ বিচারিক ব্যবস্থাপনা এবং 'ক্বাজাউস সুক' (Market administration) অর্থাৎ বাজার বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। রসুলাল্লাহ নারীদেরকে যুদ্ধের বিপদসংকুল ময়দানেও নিয়ে গেছেন, যেখানে তারা অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে বীরত্বের দিক থেকে তারা পুরুষ যোদ্ধাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। নারী সাহাবী উম্মে আম্মারা (রা.) ওহুদ, বনি কুরাইজা, হুদায়বিয়া, খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে রসুল (সা.) এর জীবন রক্ষায় একাই একটি প্রতিরক্ষা বলয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; যার দরুন মহানবী (সা.) তাঁকে 'খাতুনে ওহুদ' বা 'ওহুদের রানি' উপাধি দিয়েছিলেন।

অথচ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে সর্বপ্রকার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিশ বছর পর আবারও তালেবানরা আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেছে। শুরুতে তারা পূর্বের কট্টরপন্থা থেকে সরে আসার আভাস দিলেও বাস্তবে খেলাফতের নামে রসুলাল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ঠিক বিপরীত ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা করছে।

আফগানিস্তানে নারীদের জন্য সব ধরনের খেলাধুলাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তালেবানের সাংস্কৃতিক কমিশনের উপ-প্রধান, আহমদুল্লাহ ওয়াসিক জানান, "নারীদের জন্য খেলাধুলা করাটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ক্রিকেট আর অন্য যেসব খেলায় নারীদের বেপর্দা হওয়ার সুযোগ থাকে সেসব খেলা ইসলাম অনুমোদন করে না। গণমাধ্যমের এই যুগে সহজেই ছবি আর ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। আর সেসব পুরুষরাও দেখেন। ইসলাম নারীদের এভাবে চলাফেরার অনুমোদন দেয় না।" (৮ সেপ্টম্বর ২০২১, দৈনিক কালেরকণ্ঠ)। অথচ যেসব খেলায় মানুষের শারীরিক সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় সেগুলোকে ইসলাম উৎসাহিত করে।

ইতোমধ্যেই আফগানিস্তানে নারীদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পদচ্যুত করা হচ্ছে। তালেবান জ্যেষ্ঠ নেতা ওয়াহেদউদ্দিন হাশিমি বলেছেন, পুরুষের পাশাপাশি কাজ করা আফগান নারীদের উচিত নয় (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিডি নিউজ ২৪.কম)। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়টিই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় তারা এমন একটি বিভাগ চালু করেছে যার প্রধান কাজ কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করা (বিবিসি, ১৮ সেপ্টম্বর ২০২১)। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় একজন নারীকেও জায়গা দেওয়া হয়নি। কিছু নারী সাহস করে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছিলেন। তাদেরকে বেধড়কভাবে মারধোর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তালেবানের মুখপাত্র সৈয়দ জেকরুল্লাহ হাশিমি আফগানিস্তানের সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, নারীরা মন্ত্রী হতে পারবেন না; তাদের কাজ শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া। (১০ সেপ্টেম্বর দৈনিক সমকাল)

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কি রসুলাল্লাহর নারী সাহাবিরা কি মা হন নি, সন্তানদের লালন-পালন করেন নি? অবশ্যই করেছেন।

আফগানিস্তানে নারীদের জন্য সব ধরনের খেলাধুলাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তালেবানের সাংস্কৃতিক কমিশনের উপ-প্রধান, আহমদুল্লাহ ওয়াসিক জানান, "নারীদের জন্য খেলাধুলা করাটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ক্রিকেট আর অন্য যেসব খেলায় নারীদের বেপর্দা হওয়ার সুযোগ থাকে সেসব খেলা ইসলাম অনুমোদন করে না। গণমাধ্যমের এই যুগে সহজেই ছবি আর ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। আর সেসব পুরুষরাও দেখেন। ইসলাম নারীদের এভাবে চলাফেরার অনুমোদন দেয় না।" (৮ সেপ্টম্বর ২০২১, দৈনিক কালেরকণ্ঠ)। অথচ যেসব খেলায় মানুষের শারীরিক সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় সেগুলোকে ইসলাম উৎসাহিত করে। রসুলাল্লাহ স্বয়ং আম্মা আয়েশার (রা.) সঙ্গে একাধিকবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ- ২৫৭৮)

তালেবানের নতুন আইনে নারী রোগীদের সেবা দিতে আতঙ্কে আছেন পুরুষ চিকিৎসকরা। উপরন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ। জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচি সংস্থা-ইউএনএফপিএ বলছে, "আন্তর্জাতিক সাহায্য বন্ধ হলে, আফগানিস্তানে আগামী চার বছরে মৃত্যু হবে, অন্তত ৫১ হাজার প্রসূতির। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হতে পারে, প্রায় অর্ধকোটি। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা বঞ্চিত হবেন কোটি মানুষ।" (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, চ্যানেল ২৪)

• নারী-পুরুষের সহশিক্ষা প্রসঙ্গে

এই রসুলাল্লাহর তাঁর জাতির নারীদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুললেন, তিনি কি নারীদের জন্য আলাদা কোনো শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন? না। তাঁর শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মসজিদে নববী। সেখানে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের অবাধ যাতায়াত ছিল। নারী-পুরুষ সকলে একসঙ্গে বসে রসুলাল্লাহর ভাষণ শুনেছেন, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেছেন। মসজিদে নববীতে নারীদের জন্য পর্দা ঘেরা পৃথক কোনো বসার জায়গা রসুলাল্লাহ তৈরি করেন নি, সাহাবিরাও করেন নি। কিন্তু আজকে আমরা দেখি পর্দার অজুহাতে সহশিক্ষাকে হারাম করা হচ্ছে। হাজার হাজার বক্তা সহশিক্ষার বিরুদ্ধে বয়ান করছেন, হাজার হাজার প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে সহশিক্ষার কুফল সম্পর্কে। কিন্তু কেউই রসুলাল্লাহ নিজে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন সেটার উল্লেখ করছেন না, সেটাকে মান্য করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন না। যেসব কারণে সহশিক্ষা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, সেই কারণগুলোকে দূর করার চিন্তা কেউ করছেন না। সহজ উপায় হিসাবে নারীদেরকে শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে।

সম্প্রতি আফগানিস্তানে আমরা দেখলাম মেয়েদেরকে হাইস্কুল থেকে বাদ দেওয়া হলো। ঠিক একই মনোভাব আমরা দেখেছিলাম একজন মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পরিচালকের বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের ফোর-ফাইভের বেশি পড়াশুনা করার দরকার নেই।

ভালো কথা, মেয়েরা উচ্চশিক্ষা নেবে না, খেলাধুলা করবে না, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে না, পর্দার অন্তরালে থাকবে। মাতৃত্ব করবে। তাহলে মেয়েরা তাদের চিকিৎসার জন্য কি পুরুষ চিকিৎসকদের কাছে যাবে? তখন কি পর্দার খেলাফ হবে না? ধর্ম এসেছে মানুষের জীবনের সংকটগুলোর সমাধান করতে। আজকে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মকেই একটা ভয়াবহ সংকটে পরিণত করেছেন আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শায়েখ ও মুফতিগণ। এই কট্টরপন্থী জবরদস্তিমূলক মানবতাহীন কথিত ধর্মীয় শরিয়তের ভয়ে ভীত আফগানিস্তানের বহু বাসিন্দা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। তালেবানদের ইসলাম তাদের মন জয় করতে পারে নি, বরং আতঙ্কিত করেছে। গর্ভবতী মা পালিয়ে যাওয়ার পথে বিমানে সন্তান জন্ম দিয়েছেন।

তালেবান নিয়ন্ত্রণ শুরু হওয়ার মাত্র এক মাসের মধ্যেই ভেঙে পড়েছে আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। বেঁচে থাকার আকুতিতে আফগানিস্তানের হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন হাজারো মানুষ। নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম। নেই প্রাণরক্ষাকারী ওষুধ। জ্বালানী তেলের অভাবে বন্ধ জেনারেটর সেবা। আর এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে সন্তান জন্ম দেয়া মা এবং নবজাতকের চিকিৎসা খাতে।

ধাত্রীদের মাধ্যমে প্রসব করানো হচ্ছে, পুরুষ চিকিৎসকদের সেবা তারা নিতে পারছেন না। আফগান নারীদের কাছে সন্তান প্রসব এখন 'আতঙ্ক'। (২০ সেপ্টেম্বর ২০২১, একুশে টিভি)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বিশ্বে কোন নারীর মা হওয়ার জন্য বিশ্বে সবচেয়ে বিপজ্জনক রাষ্ট্র আফগানিস্তান। সবচেয়ে বেশি মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার আফগানিস্তানে। সেখানে প্রতি দশ হাজার জীবিত নবজাতক জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান ৩৮ জন নারী।

তালেবানের নতুন আইনে নারী রোগীদের সেবা দিতে আতঙ্কে আছেন পুরুষ চিকিৎসকরা। উপরন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ। জাতিসংঘ খাদ্য

কর্মসূচি সংস্থা-ইউএনএফপিএ বলছে, "আন্তর্জাতিক সাহায্য বন্ধ হলে, আফগানিস্তানে আগামী চার বছরে মৃত্যু হবে, অন্তত ৫১ হাজার প্রসূতির। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হতে পারে, প্রায় অর্ধকোটি। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা বঞ্চিত হবেন কোটি মানুষ।" (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, চ্যানেল ২৪)

অথচ রুফায়দাহ আসলামিয়া (রা.) ও অন্যান্য নারী সাহাবীরা তো আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে যুদ্ধাহত যেকোনো পুরুষ সাহাবীদেরকেই চিকিৎসা করতেন। এবং সেটা করতেন মসজিদে নববীর প্রাঙ্গনে। তখন তো কেউ পর্দার খেলাফ হবে এমন ফতোয়ার ঝাণ্ডা ওড়ান নি। তাহলে আজ এটা কোন ইসলামের চর্চা আমরা দেখতে পাচ্ছি?

আজকে আমরা ফতোয়াবাজদের বয়ানে যে ইসলামের পরিচয় পাচ্ছি সেখানে এটা চিন্তারও বাইরে যে, একজন নারী নিজেই কেবল উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন তা-ই নয়, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। সেটা ছিল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ক্লাস ফোর-ফাইভ পর্যন্ত পড়ার ইসলামের জন্ম তখনও হয় নি। মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র বাগদাদ, কর্ডোভা ও মিশরের বড় বড় মাদ্রাসা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে জ্ঞান আহরণ করে যখন ইউরোপে জ্ঞানের চর্চা শুরু হলো, সেখানে মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান হলো।

একটি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন করি। বলুন তো, পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? Who founded the first university in the world লিখে গুগোলে সার্চ করলেই জবাবটা পেয়ে যাবেন। তিনি হচ্ছেন ফাতেমা আল ফিহরি। মরোক্কোর ফেজ শহরে ২৫৪ হিজরি সন মোতাবেক ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম-অমুসলিম শিক্ষার্থীগণ এখানে পড়তে আসতেন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে পড়াশুনা করে সনদলাভ করতেন।

আজকে আমরা ফতোয়াবাজদের বয়ানে যে ইসলামের পরিচয় পাচ্ছি সেখানে এটা চিন্তারও বাইরে যে, একজন নারী নিজেই কেবল উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন তা-ই নয়, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। সেটা ছিল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ক্লাস ফোর-ফাইভ পর্যন্ত পড়ার ইসলামের জন্ম তখনও হয় নি। মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র বাগদাদ, কর্ডোভা ও মিশরের বড় বড় মাদ্রাসা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে জ্ঞান আহরণ করে যখন ইউরোপে জ্ঞানের চর্চা শুরু হলো, সেখানে মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান হলো। সেখানেও গড়ে উঠতে লাগল মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি, তখন ইউরোপীয় ছাত্ররা মুসলিম সভ্যতার মহান শিক্ষক ও দার্শনিকগণ যে ধরনের পোশাক পরতেন, তারাও সেই পোশাক পরিধান করাকেই গৌরবের পরিচায়ক বলে মনে করতেন। আজও পাশ্চাত্যের অনুকরণে পরিচালিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা গ্রাজুয়েট হন তারা সনদ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যে গাউনটি পরেন সেটা আরবীয় পোশাকের অনুকরণেই তৈরি। মুসলিম স্বর্ণযুগের মহান চিকিৎসক ইবনে সিনার পোশাকের অনুকরণেই ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ্রাজুয়েটদের জন্য এই ধরনের গাউনের প্রচলন ঘটিয়েছিল।

নারী ও পুরুষ উভয়ই বাবা আদমের সন্তান। তাই বাবা আদমকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন তার উত্তরাধিকার নারী-পুরুষ উভয়ই। এখানে কেউ ফতোয়া দিয়ে কাউকে জ্ঞান-অর্জন থেকে বিরত রাখতে পারে না, জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে ব্যবসায়িক পণ্যেও পরিণত করতে পারে না। জ্ঞানের এই রাজ্যে সবার সমান অধিকার।

[লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট; ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১৫৭১৫৮১, ০১৭১১০০৫০২৫]

ভিজিট করুন
WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG

মহাশক্তি ঈমানের অপব্যবহার আর নয়

রুফায়দাহ পন্নী

রুফায়দাহ পন্নী, বাংলাদেশে মুসলিম নারী জাগরণে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখছেন।

মানুষের ঈমান মহাশক্তিশালী চেতনা যা দিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে, মানুষকে জান্নাতে নিতে পারে। কিন্তু যদি ঈমানদার ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে আকিদা ভুল হয় তাহলে সেই ঈমানই ধ্বংসাত্মক ও ভয়ানক সঙ্কট সৃষ্টি করে। এজন্যই বোধহয় সমস্ত আলেমগণ একমত ছিলেন যে আকিদা সহিহ না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই। এবং স্বভাবতই ঈমানের কোনো দাম না থাকলে ঈমানভিত্তিক আমলও মূল্যহীন হয়ে যায়। আকিদা সঠিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে অর্থাৎ আকায়েদ নিয়ে হাজার হাজার বই রচনা করেছেন।

সংক্ষেপে আকিদা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সম্যক ধারণা, ইসলামের কোন কাজটি কেন করতে হয়, না করলে কী ক্ষতি হয় এটা বোঝা। এ জানলে একজন মানুষ বুঝতে পারবে যে ইসলামের কোন কাজটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ। এটা বোঝা যে আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, নবী-রসুল পাঠিয়েছেন, কেতাব দিয়েছেন? সেটা কি দেখে দেখে পড়ার জন্য নাকি প্রতিষ্ঠা করার জন্য? ধর্ম আগমনের উদ্দেশ্য কী, মানব জীবনের সার্থকতা কী, কোন কাজটা সওয়াবের, কোন কাজটা গোনহের, কোনটা মানবতার কল্যাণ করবে কোনটা মানবতার ক্ষতি করবে, কোনটি করলে ব্যক্তির পরিশুদ্ধি আসবে, কোনটি করলে সমাজের পরিশুদ্ধি আসবে ইত্যাদি সামগ্রিক জানার নাম হল আকিদা। আল্লাহ স্বয়ং, তাঁর সমস্ত সৃষ্টি, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, তকদির ইত্যাদি বিষয়গুলোও আকিদার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এই আকিদা সঠিক হওয়া প্রত্যেক মো'মেনের জন্য অপরিহার্য। তা না হলে ধর্মের কর্তৃপক্ষ দাবিদার স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বার বার মানুষের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে তাণ্ডবলীলা বাধিয়ে দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার করবে। দুঃখজনক এই দৃশ্য আমরা সারা দুনিয়ার ইতিহাসে ও বর্তমানেও দেখতে পাচ্ছি।

কিছুদিন পর পর আমাদের দেশে এমনই দাঙ্গাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ধর্মীয় বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে। ঈমানের দাবি পূরণ করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই পরিস্থিতিতে জড়িত জড়িত হয়ে যায়। এসব পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রায়ই গুজব ব্যবহার করা হয়, মিথ্যা কথা, অর্ধসত্য এমন কি ডাহা মিথ্যা কথাও প্রচার করা হয়। অর্থাৎ যে কোনো প্রকারেই হোক একটি ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই-ই চাই। তাছাড়া দেশে যখন একটি প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা আছে, আইন-আদালত আছে সেখানে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে এভাবে তাণ্ডব সৃষ্টি করে দিলে ধর্মও রক্ষা হয় না, দেশও রক্ষা হয় না, ঈমানও রক্ষা হয় না। সবদিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

> ***রাষ্ট্র যদি ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান না হয় তাহলে কোনোভাবেই অসন্তোষের অগ্নুৎপাতকে ফেরাতে পারবে না, কোনো না কোনো ইস্যু দিয়ে সে তার জ্বালামুখ খুঁজে নেবেই। আজ রাষ্ট্রধর্ম তো কাল শিক্ষানীতি, পরশু ধর্ম অবমাননা ইত্যাদি। ইস্যুর কোনো অভাব হবে না, ইস্যুগুলো কেবল একটার পর একটা সৃষ্টি হতেই থাকবে। এই সব ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন ও সহিংসতার মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। এভাবে তো বেশি দিন চলা যাবে না। আর এজন্য শুধু শুধু ধর্মকে দোষারোপ করে লাভ নেই, রাষ্ট্র ন্যায়দণ্ড ধারণ করুক, জাতি রক্ষা পাবে।***

আর এদিকে ধর্মনিরপেক্ষ তাত্ত্বিক ও রাজনীতিকরা একটি শ্লোগান চালু করেছেন যে, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। এটা নিয়ে তর্কে যাব না। কিন্তু মনে রাখতে হবে সকল বস্তুর যেমন ধর্ম রয়েছে, রাষ্ট্রেরও একটি ধর্ম রয়েছে। কিন্তু সেটা প্রচলিত অর্থে ইসলাম-হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ ধর্ম নয়। বস্তুর ধর্ম না থাকলে যেমন বস্তুর স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি রাষ্ট্রও ধর্ম হারালে তার অস্তিত্ব থাকে না। ধর্ম মানে ধারণ করা। রাষ্ট্রের ধর্ম কী? সে কী ধারণ করবে? সেটা হচ্ছে ন্যায়। সে ন্যায়দণ্ড ধারণ করবে। যেটা ন্যায় সেটা দুর্বলতম ব্যক্তি বললেও সেটাকে ন্যায় বলে গ্রহণ করতে হবে, যেটা অন্যায় সেটাকে অন্যায় হিসাবেই প্রতিপন্ন করতে হবে, সেটা যত বড় ক্ষমতাশালীই করুন না কেন। এই ন্যায়ধর্ম হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি। রাষ্ট্র যদি হুজুগ কিংবা একটি গোষ্ঠীর অনুভূতি দ্বারা চালিত হয়ে ন্যায়কে বিসর্জন দেয় তাহলে রাষ্ট্র সময়ের স্রোতে ধ্বসে যাবে।

কীভাবে? রাষ্ট্র যখন তার এই ন্যায় ধর্ম ত্যাগ করবে তখন জনগণ রাষ্ট্রের উপর আস্থা হারাবে। তখন আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হবে, ডাকাতকে পুলিশে না দিয়ে নিজেরাই মেরে ফেলবে। পৃথিবীতে যে রাষ্ট্রগুলো তার ন্যায়ধর্ম হারিয়েছে সেখানেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের আস্থা অর্জন ছাড়া কোনো রাষ্ট্র টিকতে পারে না। আর জনগণের আস্থা ফিরে পেতে হলে রাষ্ট্রকে তার ন্যায়বিচারের ধর্ম ধারণ করতেই হবে।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের সামষ্টিক অসন্তোষ প্রকাশের জন্য একটি মতবাদের ভাষা লাগে, একটি জ্বালামুখ লাগে। সমাজতন্ত্রের আদর্শের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের পচন ও পতনের পর তাদের একটি অংশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে প্রতি-বিপ্লবীদের দ্বারা সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে যায়। ঠিক একই অবস্থা হয়েছে আজ ইসলামের বেলায়। মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদী শোষণ, ইসলামবিদ্বেষী প্রপাগান্ডা ও সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশের অবলম্বন হিসাবে এখন ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এখানেও একটি অংশ মতবাদভিত্তিক সন্ত্রাস তথা জঙ্গিবাদ বা অনুভূতিবাদ।

রাষ্ট্র যদি ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান না হয় তাহলে কোনোভাবেই অসন্তোষের অগ্নুৎপাতকে ফেরাতে পারবে না, কোনো না কোনো ইস্যু দিয়ে সে তার জ্বালামুখ খুঁজে নেবেই। আজ রাষ্ট্রধর্ম তো কাল শিক্ষানীতি, পরশু ধর্ম অবমাননা ইত্যাদি। ইস্যুর কোনো অভাব হবে না, ইস্যুগুলো কেবল একটার পর একটা সৃষ্টি হতেই থাকবে। এই সব ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন ও সহিংসতার মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। এভাবে তো বেশি দিন চলা যাবে না। আর এজন্য শুধু শুধু ধর্মকে দোষারোপ করে লাভ নেই, রাষ্ট্র ন্যায়দণ্ড ধারণ করুক, জাতি রক্ষা পাবে।

পাশাপাশি বর্তমানে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার চর্চা হচ্ছে, সহিংসতার নিয়ামক হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কেবল নির্দিষ্ট একটি ধর্ম নয়, যে যেখানে সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। আমাদের এখানে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম ইসলাম তাই এখানে ইসলামের নামে অরাজকতা সৃষ্টির পথ রোধ করতে হলে রাষ্ট্রের ন্যায়ের ব্যাপারে আপোসহীন হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের প্রকৃত আকিদা সাধারণ জনগণকে অবগত করা খুবই জরুরি। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমাদের সাধারণ জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত আকিদা নেই। ইসলামের নাম বলে একেকজন

একেক দিকে তাদের ঈমানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একেক গোষ্ঠী একেকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করছে। কেউ মানুষ হত্যা করাকে জেহাদ-কেতাল আখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করছে, কেউ কেউ রাজনীতিক স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার জনগণের ধর্মীয় চেতনাকে। যেভাবে হালভাঙা নৌকা মুহুর্মুহু স্রোতের টানে দিক পাল্টায় ঠিক সেভাবে কোর'আন হাদীসের উক্তি ব্যবহার করে যখন জনগণের সামনে কেউ তার প্রচারণা চালায় তখন ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঈমান বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। তাদেরকে যেন এভাবে যে যেভাবে খুশি বিভিন্ন চোরাগলিতে টেনে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য প্রয়োজন তাদেরকে ধর্মের প্রকৃত পথটি দেখিয়ে দেওয়া অর্থাৎ তাদের আকিদা ঠিক করে দেয়া। ধর্মের পূর্ণ ও প্রকৃত চিত্রটি তাদের সামনে তুলে ধরা। এখন এটা লাগবে। এটা যতদিন না করা হবে ততদিন মানুষ গুজব শুনে ধর্মরক্ষার জন্য উন্মাদিত হবে।

আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব কে? নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসুল (সা.)। আসুন দেখি তিনি কীভাবে মানুষের ঈমানকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করেছেন এবং মানুষের আকিদাকে বিকৃত হতে দেন নি। তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ মহামানব ছিলেন যিনি তাঁর জীবনে কোনো কাজই মিথ্যার ভিত্তিতে, গুজবের ভিত্তিতে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন নি। মদীনায় তাঁর ৩ বছরের ছেলে ইব্রাহিম যেদিন ইন্তেকাল করলেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হলো। আরবের নিরক্ষর, অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মনে এই ধারণা হলো যে, যার ছেলে মারা যাওয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়, তিনি তো নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল, না হলে তাঁর ছেলের মৃত্যুতে কেন সূর্যগ্রহণ হবে। কাজেই চলো, আমরা তাঁর হাতে বায়াত নেই, তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নেই, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করি। তাদের এ মনোভাব মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল। আল্লাহর রসুল (সা.) যখন একথা শুনতে পেলেন, তিনি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে লোকজন ডাকলেন এবং বললেন– "আমি শুনতে পেলাম তোমরা অনেকেই বলছ, আমার ছেলে ইব্রাহিমের ইন্তেকালের জন্য নাকি সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ কথা ঠিক নয়। ইব্রাহিমকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্যগ্রহণ একটি প্রকৃতিক নিয়ম। এর সাথে ইব্রাহিমের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।" (হাদীস, মুগীরা ইবনে শো'বা ও আবু মাসুদ (রা:) থেকে বোখারী)।

এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক খেয়াল করুন। ঐ সময় মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড টানাপড়েন ও বিতর্ক চলছে যে তিনি আসলেই আল্লাহর রসুল কি রসুল নন। এমতাবস্থায় রসুলাল্লাহ কিছু না বলে যদি শুধু চুপ করে থাকতেন, কিছু নাও বলতেন, দেখা যেত অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান এনে ইসলামে দাখিল হতো, তাঁর উম্মাহ বৃদ্ধি পেত - অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই কাজে তিনি অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এসেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে, তাই তিনি এতটুকুও আপোস করলেন না। এতে তাঁর নিজের ক্ষতি হলো। কিন্তু যেহেতু এ কথা সত্য নয় গুজব, সত্যের উপর দৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে তিনি সেটিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলেন না। তিনি শক্তভাবে এর প্রতিবাদ করলেন, তিনি জনগনের ঈমানকে সঠিক করে দিলেন। নিজের স্বার্থে তাদের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করেন নি। তাহলে সেখানে তাঁর উম্মত দাবি করে মুসলিমরা কীভাবে হুজুগের সুযোগ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক অভিসন্ধি হাসিল করতে পারেন? গুজবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে মো'মেনদেরকে আল্লাহ নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেছেন, কেউ যেন কারো উপর অপবাদ আরোপ না করে এবং কোনো দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে বিশ্বাস করার আগে যেন তা অবশ্যই যাচাই করে নেয় (সুরা হুজরাত-৬)।

সুতরাং ধর্মকে যদি কল্যাণকর কাজে, জাতির উন্নয়নে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর ধর্ম সম্পর্কে ধারণা, আকিদা সঠিক করতে হবে এবং পাশাপাশি সরকারকে সর্ব বিষয়ে ন্যায়ের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হতে হবে। অন্যথায় জাতি ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যাবে এবং সেটা থেকে উত্তরণের সময় থাকবে না একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিশেষ করে যখন আমাদের সামনে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের উদাহরণ রয়েছে তখন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়া আত্মঘাতী বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

[লেখক: নারী বিষয়ক সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ; যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৭১১৫৭১৫৮১]

দীন প্রতিষ্ঠা বলতে আমরা কী বুঝি?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা দীন প্রতিষ্ঠা বলতে কী বোঝায়? এর মানে আসলে কী? কীভাবে বুঝব কোনো দেশে দীন প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা? ধরুন, একটি গোষ্ঠী দাবি করল তারা দীন প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের দাবি সঠিক নাকি ভুল, সেটা বোঝার উপায় কী? তাদের লম্বা দাড়ি বা গায়ে আরবীয় জোব্বা থাকলেই কি আমরা ধরে নিব তারা দীন প্রতিষ্ঠা করেছে? নাকি দেশের নাম ইসলামিক আমিরাত বা ইসলামিক স্টেট বা ইসলামিক রিপাবলিকান ইত্যাদি রাখলে ধরে নিব দীন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে? আসলে বিষয়টা বোঝার উপায় কী?

দীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে দীন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে সেটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। দীন মানে জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীতে জীবনব্যবস্থা মূলত দুই ধরনের হয়। এক- আল্লাহর দেওয়া, দুই- মানুষের তৈরি করে নেওয়া। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম, যার আভিধানিক অর্থ শান্তি। আল্লাহ তার জীবনব্যবস্থার নাম "শান্তি" রেখে মানুষকে বোঝাচ্ছেন- হে মানুষ! তোমরা যে শান্তির দেখা পেতে সারা বিশ্ব তোলপাড় করে ফেলছো, যদি আমার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করো তাহলেই কেবল তোমাদের জীবনে সেই মহাকাঙ্ক্ষিত "শান্তি" আসবে, অন্যথায় আসবে না। যুগে যুগে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ দীন পাঠিয়েছেন এবং শেষবার আখেরী নবীর মাধ্যমে যখন দীন পাঠিয়েছেন, তখন মো'মেনদের জন্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। (হুজরাত ১৫)

গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। বহু আন্দোলন ও সংগঠনের জন্ম হয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। কোথাও তারা রাজনৈতিকভাবে, কোথাও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, কোথাও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তারা দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিশ্বের বহু দেশে তারা সফলও হয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে। যখনই তারা কোথাও ক্ষমতায় গেছে, অনেকে ধরেই নিয়েছে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। তাদেরকে নিয়ে অনেকে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে।

কিন্তু ওইসব দল কথিত দীন প্রতিষ্ঠার পর শান্তির ছিটেফোঁটাও দেখাতে পেরেছেন কি? তারা কি পেরেছেন ন্যায়, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে? তারা কি পেরেছেন নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে? তারা কি পেরেছেন জনগণকে বাক স্বাধীনতা দিতে? তারা কি পেরেছেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে? তারা কি পেরেছেন মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে? উত্তর আমাদের সবারই জানা। তারা পারেননি। শুধু যে পারেননি তাই নয়, তারা ধর্মের নামে এমন ব্যবস্থা জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন যেটা জনগণকে মুক্তির স্বাদ দেওয়ার বদলে বন্দীত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে। কথা বলা যাবে না, গান শোনা যাবে না, ছবি আঁকা যাবে না, দাড়ি কাটা যাবে না, নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না, খেলাধুলা করা যাবে না, টেলিভিশন দেখা যাবে না, মেয়েরা পড়াশোনা করা যাবে না ইত্যাদি বিধিনিষেধ আরোপ করে জনগণকে শাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। ফলে মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেছে এটা ইসলাম নয়, এটা শান্তি নয়। এটা ইসলামের নামে আরেক জবরদস্তির নাম। সেই জবরদস্তি থেকে বাঁচার জন্য এক সময় মুসলিম ঘরের ছেলে মেয়েরাই সংগ্রাম করে তথাকথিত ইসলামী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। তাহলে কী বোঝা গেল?

বোঝা গেল- কোথাও দাড়ি টুপিওয়ালা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল দেখলেই সেটাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা দীন প্রতিষ্ঠা বলে খুশিতে আত্মহারা হবার সুযোগ নেই। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, দাড়ি টুপি আর আলখেল্লার নাম ইসলাম নয়। ইসলাম হলো ন্যায়, শান্তি, সুবিচার, নিরাপত্তা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবার নাম। কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা, বা আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা সেটা বিচার করারও মাপকাঠি দাড়ি টুপি জোব্বা বোরকা পাঞ্জাবি নয়। সেটা বিচারের মাপকাঠি হলো- ওই সমাজের মানুষ শান্তির দেখা পেয়েছে কিনা, মানবাধিকার পেয়েছে কিনা, নিরাপত্তা পেয়েছে কিনা, নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা সেটা।

• পাঠক, আরও পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য হাদিসের পাতা থেকে দু'টি ঘটনা তুলে ধরছি।

১. প্রচণ্ড নির্যাতনের মুখে অধৈর্য্য হয়ে একবার খাব্বাব (রা.) বিশ্বনবীর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের জন্য দোয়া করুন। বিশ্বনবী তখন কী বলেছিলেন তা ইতিহাস হয়ে আছে। বিশ্বনবী বলেছিলেন, শিঘ্রই এমন সময় আসবে যখন সানা থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত একা একজন আরোহী পথ চলবে, তার মনে আল্লাহ ও বন্য জন্তু ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না। দীন প্রতিষ্ঠার পর কেমন সমাজ তৈরি হবার কথা, সেটা এই হাদিসেই বোঝা যাচ্ছে। সমাজ থেকে ভয় জিনিসটা উঠে যাবে। কোনোকিছু হারানোর ভয় থাকবে না। মানুষ মাইলের পর মাইল পথ চলবে নির্বিঘ্নে।

২. এবার দেখুন হাতিম তাইয়ের ছেলে আদির সাথে রসুলাল্লাহর কথোপকথন। আল্লাহর রসুল আদিকে বললেন- 'হে আদি, তুমি বোধহয় ইসলাম গ্রহণ করছ না আমার আশপাশের মানুষগুলোর অবস্থা দেখে। তুমি কি আল-হিরার নাম শুনেছ?' আদি বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি, তবে কখনো যাইনি ওই শহরে।' নবী (সা.) বললেন, 'শিঘ্রই এমন সময় আসবে যখন একজন নারী একা হিরা থেকে মক্কায় আসবে তার মনে কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না।' অর্থাৎ এই হাদিসেও সেই একই কথা। কোনো ভয় থাকবে না। কতখানি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হবে বোঝাই যাচ্ছে।

পাঠক, হাদিসের আরেকটি দিক লক্ষ করুন। আল্লাহর রসুল দীন প্রতিষ্ঠার পর কেমন সমাজ তৈরি হবে তা বলতে গিয়ে নারীদের সম্পর্কে কী বললেন? তিনি কিন্তু বলেননি- হে খাব্বাব! দীন প্রতিষ্ঠা হলে হিরা থেকে মক্কা পর্যন্ত একজন নারীও ঘরের বাইরে বেরোতে পারবে না, একজন নারীরও চেহারা দেখা যাবে না, একজন নারীও পড়াশোনা করতে পারবে না, একজন নারীও চাকরি বাকরি করতে পারবে না ইত্যাদি! রসুল (সা.) এসব কথা বললেন না, কারণ এই নারীবিদ্বেষী আইন প্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। বরং তিনি কী বললেন খেয়াল করুন। তিনি বললেন, দীন প্রতিষ্ঠার পর একজন নারী একা হিরা থেকে মক্কায় আসবে কিন্তু সেই নারীর মনে কোনো ভয় থাকবে না। একবার ভাবুন তো, একজন নারী শত শত মাইল পথ চলছে একা একা, কিন্তু কোনো ভয় নেই। তাহলে ওই সমাজের নিরাপত্তা কেমন হতে হবে? মূলত তেমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার নামই হলো 'দীন প্রতিষ্ঠা'। আল্লাহর রসুল স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামের উদ্দেশ্য নারীকে ঘরের মধ্যে বন্দী করা নয়, বরং নারী যাতে একা একা শত শত মাইল পথ নির্ভয়ে চলতে পারে, সমাজে কোনো চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, ইভটিজিং না থাকে তেমন পরিবেশ তৈরি করা!

বলা বাহুল্য, আল্লাহর রসুল ঠিকই সেই সমাজ তৈরি করতে পেরেছিলেন। দীন প্রতিষ্ঠার পর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীটি কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল তার ইতিহাস নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। আদি ইবনে হাতিম তাঁর জীবদ্দশাতেই সেই দৃশ্য দেখে গেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

সুতরাং আজ যারা দীন প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন, তাদের টুপি দাড়ি বা লেবাস দেখে নয়, তাদেরকে বিচার

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে দাড়ি কাটা নিষিদ্ধ করেছে তালেবান। (ছবি: বিবিসি বাংলা)

করা দরকার তারা কেমন সমাজ তৈরি করল সেটা দেখে। ক্ষমতা দখল করা তো কঠিন নয়, কঠিন হলো জনগণকে শান্তি নামক সোনার হরিনটি পাইয়ে দেওয়া। ক্ষমতা দখল করার জন্য ইসলাম লাগে না, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের চেতনা কাজে লাগিয়েও বিশ্বের বহু দেশে ক্ষমতার উত্থান পতন হয়ে থাকে। তেমনি ইসলামের চেতনা ব্যবহার করেও ক্ষমতা দখল করা সম্ভব। কিন্তু যদি সেটা সত্যিকারের ইসলাম না হয়ে থাকে, যদি সেটা আল্লাহ-রসুলের দেওয়া প্রকৃত ইসলাম না হয়ে থাকে, তাহলে তা কস্মিনকালেও ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আর তা না পারলে কখনই সেটাকে দীন প্রতিষ্ঠা বলা যাবে না।

[মতামতের জন্য যোগাযোগ: ০১৭১১৫৭১৫৮১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫]

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে সম্পাদিত

রসুলাল্লাহর (দ.) ক্রোধ ও ক্ষমা

মহানবীর (দ:) ৬০/৭০ বছর পর থেকে যে সব বিকৃত এই দীনের মধ্যে প্রবেশ করে উম্মাহকে তার লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিল এবং কালক্রমে তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি থেকে নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত করল সেগুলোর মধ্যে প্রধান বিকৃত ছিল দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি। আল্লাহ কোর'আনে একাধিকবার দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। Commit no excesses in your religion (সুরা নিসা ১৭১)। আবার বলেছেন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে (সুরা আল মায়েদা ৭৭)।

দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার এই নিষেধের অর্থ কী? এর মানে কি এই যে, খুব ধার্মিক হয়োনা বা দীনকে ভালোভাবে অনুসরণ কর না, বা বেশি ভালো মুসলিম হবার চেষ্টা কর না? অবশ্যই তা হতে পারে না। এই বাড়াবাড়ির অর্থ, আল্লাহ যতটুকু করতে বলেছেন ততটুকু করা। তার চেয়ে বেশি না করা। সওয়াবের আশায় নিজেদের উপর বাড়তি কঠোরতা আরোপ না করা। এতে সওয়াবের বদলে গোনাহই বৃদ্ধি পাবে এবং জাতি সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।

একইভাবে আল্লাহর নবীও তাঁর বিদায় হজের ভাষণসহ বিভিন্ন খোতবায় দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। শুধু তাই নয়, যখনই তিনি দীনের কোনো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখেছেন তার আসহাবদের মধ্যে তখনই রেগে গেছেন। যেমন একদিন একজন লোক এসে আল্লাহর রসুলের (দ.) কাছে অভিযোগ করলেন যে অমুক লোক নামায লম্বা করে পড়ান কাজেই তার (পড়ানো) জামাতে আমি যোগ দিতে পারি না। শুনে তিনি এত রাগান্বিত হয়ে গেলেন যে -বর্ণনাকারী আবু মাসউদ (রা.) বলছেন যে- আমরা তাকে এত রাগতে আর কখনও দেখি নি (বোখারী)।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে মসলাহ জানতে চাইলে বিশ্বনবী (দ.) প্রথমে তা বলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইতো তাহলেই তিনি রেগে যেতেন। কারণ তিনি জানতেন

ঐ কাজ করেই অর্থাৎ ফতওয়াবাজী করেই তার আগের নবীদের জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

কিন্তু তার অত ক্রোধেও অত নিষেধেও কোন কাজ হয় নি। তার জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের জাতিগুলির মত দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে অতি মুসলিম হয়ে মসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে শিয়া-সুন্নী, হানাফি-হাম্বলী, সালাফি-দেওয়বন্দী ইত্যাদি হাজারো বিভেদ সৃষ্টি করে শক্তিহীন হয়ে শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে।

কী ধরনের বিষয়ে আল্লাহর রসুল (দ.) রেগে যেতেন তা দেখা গেল। এবার দেখা যাক কী ধরনের বিষয়ে তিনি ক্রোধান্বিতও হন নি। যেমন:

(ক) ব্যভিচার। এক যুবক একদিন রসুলাল্লাহর কাছে এসে বলল "আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই, কিন্তু আমি ব্যভিচার (যেনা) থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারব না"। হাদিস বর্ণনাকরী বর্ণনা করছেন যে সেই মহামানব রাগ তো করলেন না-ই বরং ঐ যুবককে স্নেহভরে নিকটে ডেকে বসিয়ে বললেন, তোমার মা, বোন, মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করলে তুমি কি তা পছন্দ করবে? সেই যুবক রক্তাক্ত চোখে জবাব দিল, "কেউ তা করার আগেই আমি তাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলবো।" মহানবী (দ.) বললেন "তাই যদি হয় তবে তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে তুমি যার সাথে ব্যভিচার করবে সেও তো কারো মা বা বোন বা মেয়ে (বোখারী)।"

(খ) সহিহ হাদিসে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে কোন লোক নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ব্যভিচার করে ফেলেছেন। পরে শুধু অনুতপ্ত হয়েই তারা ক্ষান্ত হন নি, তারা আল্লাহর দেয়া শাস্তি গ্রহণ করে পবিত্র হতে চেয়েছে, তারা আল্লাহর রসুলের (দ.) কাছে এসে তাদের ব্যাভিচারের কথা প্রকাশ করে দিয়ে শাস্তি চেয়েছেন। ঐসব ঘটনায় বিশ্বনবী (দ.) কী করেছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। কোন সামান্যতম রাগ করেন নি বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। ভাবটা এই রকম যে তুমি অপরাধ করে ফেলেছ তো ফেলেছই, সেটা আবার প্রকাশ করতে এসেছ কেন? তুমি না বললে তো কেউ জানবেই না যে তুমি কী করেছ। কাজেই ও গোপন ঘটনা গোপনই রাখো।

শাস্তি পেতে কৃতসংকল্প সেই লোককে যখন তিনি কিছুতেই বিরত করতে পারেন নি তখন তিনি তাকে উকিলের মত জেরা করেছেন, এই উদ্দেশ্যে যে যদি ঐ লোকের বর্ণনায় কোন খুঁত বের করতে পারেন তবে হয় শাস্তি দেবেন না বা লঘু শাস্তি দেবেন। উদাহরণ দিচ্ছি- একজন লোক মসজিদে (নববী) এসে বিশ্বনবীকে (দ.) বললেন ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি ব্যভিচার করেছি। কোন জবাব না দিয়ে মহানবী (দ.) ঘুরে অন্যদিকে হয়ে বসলেন। ঐ লোকটি ঘুরে রসুলাল্লাহর (দ.) সামনে যেয়ে আবার ঐ কথা বললেন এবং তিনি কোন জবাব না দিয়ে আবার ঘুরে অন্যদিকে হয়ে বসলেন। চারবার ওমনি করার পর অর্থাৎ প্রকাশ্যে চারবার ব্যাভিচারের ঘোষণা দেবার পর আল্লাহর রসুল (দ.) তাকে বিধিবদ্ধ শাস্তির আদেশ দিলেন (আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বোখারী, মুসলীম, মেশকাত)।

> ***একটি পুরো গোত্র সময় মত নামায পড়ে না জেনেও বিশ্বনবী (দ.) কোন রকম রাগ করেছেন বলে হাদিসের বর্ণনায় উল্লেখ নেই। একবার মহানবীকে (দ.) জানানো হলো যে অমুক লোক চুরি করে। তিনি রাগও করলেন না, উত্তেজিতও হলেন না, এমনকি ঐ লোকটিকে ধরে আনতেও বললেন না। সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন লোকটি কি নামায পড়ে? তাকে জানানো হলো যে, হ্যাঁ, সে নামায অবশ্য পড়ে। শুনে মহানবী (দ.) বললেন নামাযই চুরি থেকে একদিন বিরত করবে।***

প্রকাশ্যে জনসমক্ষে চারবার ব্যাভিচারের স্বীকৃতি ঘোষণা না করলে মহানবী (দ.) শাস্তির আদেশ দিতেন না। অনেক সময় প্রথম ঘোষণার পর অপরাধীকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতেন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবার জন্য। চারবার ফেরৎ এসে স্বীকৃতি ঘোষণার পরও তাকে জেরা করতেন বর্ণনায় খুঁত ধরার জন্য [ইয়াযীদ বিন নুয়াইম (রা:) এবং আবু হোরায়রা (রা:)]।

যখন কোন মানুষ মহানবীর (দ.) দরবারে এসে অর্থাৎ প্রকাশ্য জনসমক্ষে সবাইকে শুনিয়ে রসুলাল্লাহকে বলতেন যে তিনি ব্যভিচার করেছেন শুধু তখনই আল্লাহর নবী (দ.) বুঝে যেতেন যে ঐ লোকটির লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চ। তিনি চাচ্ছেন যে তার অপরাধে, পদস্খলের শাস্তি এই দুনিয়াতেই হয়ে যাক, যাতে তিনি পবিত্র হয়ে পরজগতে প্রবেশ করতে পারেন, যেখানে ঐ অপরাধের জন্য আবার শাস্তি হবে না। কিন্তু তা জেনেও তিনি তার শাস্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। যখন দেখতেন যে ঐ লোক এই দুনিয়াতেই পবিত্র হবার

জন্য এমন কৃতসংকল্প যে তিনি চার চারবার প্রকাশ্যে তার অপরাধের কথা ঘোষাণা করছেন শুধু তখন তিনি তাকে আল্লাহর শরিয়াহ অর্থাৎ এই দণ্ডবিধি (Penal Code) মোতাবেক শাস্তির আদেশ দিতেন।

একজন লোককে মদ খেয়ে মাতলামির জন্য শরাহ মোতাবেক শাস্তি দেয়া হলো, দিলেন বিশ্বনবীই (দ.)। কিছুদিন পর তাকে আবার নবীর (দ.) পবিত্র দরবারে ধরে নিয়ে আসা হলো ঐ একই অপরাধে অর্থাৎ মদ পান করার জন্য। এবারও তিনি যথাযথ শরাহ মোতাবেক তার শাস্তির আদেশ দিলেন। কিন্তু হাদিস বর্ণনাকারী স্বয়ং ওমর (রা:) কোনও উল্লেখ করলেন না যে রসুলাল্লাহ (দ.) কোন রকম রাগ প্রকাশ করলেন বা কোন কসমও করলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন- এর উপর আল্লাহর লা'নত হোক, একই অপরাধের জন্য একে কতবার হাযির করা হচ্ছে। ঐ সাহাবার কথা শুনে মহানবী (দ.) বললেন, "একে লানত করো না, আল্লাহর নামে আমি কসম করে বলছি এ আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালবাসে (ওমর বিন খাত্তাব (রা:) থেকে বোখারী)।" লক্ষ্য করুন, বিশ্বনবী (দ.) ঐ মদখোরের পুনঃ পুনঃ মাতলামীর জন্য কসম খেলেন না, কসম খেলেন লোকটির সমর্থনে।

আরেক দিন একজন লোক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। লোকজন তাকে ধরে মহানবীর (দ.) দরবারে নিয়ে যাবার জন্য রওয়ানা হলো। পথে ইবনে আব্বাসের (রা.) বাড়ি পড়ে। লোকজন ইবনে আব্বাসের বাড়ীর কাছে আসতেই লোকটি হঠাৎ সবার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে ইবনে আব্বাসের (রা.) বাড়ীতে ঢুকে তাকে জড়িয়ে ধরলো। লোকজন তাকে তাঁর কাছে থেকে ছাড়াতে না পেরে আল্লাহর রসুলের (দ.) কাছে যেয়ে ঘটনা বললো। রসুলাল্লাহ (দ.) ঘটনা শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন "সে তাই করেছে নাকি?" বিশ্বনবী (দ.) কোন শাস্তির কথা বললেন না।

(গ) নামায। একদিন কিছু আসহাব বিশ্বনবীর (দ.) কাছে অভিযোগ করলেন যে অমুক গোত্রের সমুদয় লোকই ফযরের নামায সময় মত পড়ে না। শুনে আল্লাহর রসুল (দ.) বললেন "তাই নাকি?" অতঃপর ঐ গোত্রের লোক সকলকে ডেকে আনা হলো। মহানবীর (দ.) প্রশ্নের উত্তরে তারা স্বীকার করলেন যে তারা ফযরের নামায ফযরের সময় পড়েন না, ঘুমিয়ে থাকেন এবং অনেক পরে ঘুম থেকে ওঠার পর পড়েন। কারণ হিসেবে আরজ করলেন যে তারা সবাই কৃষি কাজ করেন। দিনের প্রচণ্ড রৌদ্রে মাঠে কাজ করা সম্ভব নয় বলে রাত্রে কাজ করেন এবং শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েন এবং ফযরের নামায সময়মত পড়া হয় না। শুনে আল্লাহর রসুল (দ.) তাদের অনুমতি দিয়ে দিলেন তারা যেমনভাবে নামায পড়ছে তেমনি পড়ার জন্য (মুসলিম)।

> ***পাঠক পাঠিকাগণ! মোহাম্মদের (দ.) মাধ্যমে আল্লাহ যে দীন মানব জাতির জন্য পাঠিয়েছিলেন সেই দীন এবং বর্তমানে আমরা ইসলাম বলে যে দীনটাকে নিষ্ঠা ভরে পালন করি এই দুই দীন পরস্পর বিরোধী-বিপরীতমুখী। যে হাদিসগুলি উল্লেখ করেছি সেগুলো একটা একটা করে দেখুন আর চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন যে সব ঘটনায় আল্লাহর রসুল (দ.) বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, সেইসব ঘটনায় বর্তমানের ধর্মীয় নেতারা কী করবেন। মসজিদে পেশাব করলে তো মেরেও ফেলতে পারেন।***

একটি পুরো গোত্র সময় মত নামায পড়ে না জেনেও বিশ্বনবী (দ.) কোন রকম রাগ করেছেন বলে হাদিসের বর্ণনায় উল্লেখ নেই। একবার মহানবীকে (দ.) জানানো হলো যে অমুক লোক চুরি করে। তিনি রাগও করলেন না, উত্তেজিতও হলেন না, এমনকি ঐ লোকটিকে ধরে আনতেও বললেন না। সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন লোকটি কি নামায পড়ে? তাকে জানানো হলো যে, হ্যাঁ, সে নামায অবশ্য পড়ে। শুনে মহানবী (দ.) বললেন নামাযই চুরি থেকে একদিন বিরত করবে।

একদিন আল্লাহর রসুল (দ.) তার আসহাবসহ মসজিদে নববীতে বসা আছেন এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুইন আরব যে নিজেও ওখানে সবার সঙ্গে বসা ছিলো উঠে মসজিদের ভেতরেই প্রশ্রাব করতে শুরু করলো। সাহাবারা সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন- এই থামো থামো (স্বভাবতই)। কিন্তু আল্লাহর রসুল (দ.) তার সাহাবাদের বললেন ওকে বাধা দিও না, করতে দাও। তার আদেশে আসহাব বিরত হলেন এবং লোকটি প্রশ্রাব করা শেষ করলো। তারপর বিশ্বনবী (দ.) ঐ লোকটিকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললেন যে এই জায়গা আল্লাহর এবাদতের জায়গা, আল্লাহকে স্মরণ ও কোর'আন পাঠের জায়গা। কাজেই এখানে কারো পেশাব পায়খানা করা উচিত নয়। তারপর তার আদেশে পানি এনে মসজিদ ধুয়ে ফেলা হলো [আবু হোরায়রা (রা:) এবং আনাস (রা:) থেকে বোখারী ও মুসলিম]। হাদিসের বর্ণনা এবং ভাষা থেকে একথা পরিষ্কার যে এমন একটা ঘটনায় তিনি বিন্দুমাত্র রাগ

করেন নি, একটুকুও উত্তেজিত হন নি, লোকটাকে প্রশ্রাব শেষ করতে দিয়েছেন ও তারপর তাকে কাছে ডেকে শান্তভাবে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

> ***আল্লাহর সংবিধান কোর'আন এবং রসুলের (দ.) হাদিস অনুযায়ী মানুষের জীবন শাসন ও পরিচালন করা হলে, আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী আদালতে বিচার করা হলে, আল্লাহর দেয়া দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি দেয়া হলে সমাজ থেকে ব্যক্তিগত অপরাধ নিজে থেকেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রমাণ ইসলামের প্রথম ৬০/৭০ বছরের ইতিহাস।***

পাঠক পাঠিকাগণ! মোহাম্মদের (দ.) মাধ্যমে আল্লাহ যে দীন মানব জাতির জন্য পাঠিয়েছিলেন সেই দীন এবং বর্তমানে আমরা ইসলাম বলে যে দীনটাকে নিষ্ঠা ভরে পালন করি এই দুই দীন পরস্পর বিরোধী-বিপরীতমুখী। যে হাদিসগুলি উল্লেখ করেছি সেগুলো একটা একটা করে দেখুন আর চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন যে সব ঘটনায় আল্লাহর রসুল (দ.) বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, সেইসব ঘটনায় বর্তমানের ধর্মীয় নেতারা কী করবেন। মসজিদে পেশাব করলে তো মেরেও ফেলতে পারেন। অন্যদিকে যে কাজে যে ব্যাপারগুলোয় সেই সর্বরিপুজয়ী সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রেগে লাল হয়ে গেছেন, উত্তেজনা ভরে কসম খেয়েছেন সেই হাদিসগুলি একটু দেখুন। দেখবেন সেই ব্যাপারগুলো শুধু যে মহা উৎসাহ ভরে করা হচ্ছে তাই নয়, মহা পুণ্যের মহা সওয়াবের কাজ মনে করে করা হচ্ছে। যে কাজগুলোকে বিশ্বনবী (দ.) কুফর বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেই কাজ যে যত বেশি করছে আজকের এই "দীন ইসলামের" দৃষ্টিতে সে তত পাক্কা মুসলিম।

লক্ষ্য করলে আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাবেন। সেটা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিগত মহাপাপ গুনাহে কবিরার ব্যাপারেও তিনি কিছুমাত্র রাগেন নি। কিন্তু আজ আমাদের কাছে যে সব বিষয়ের কোন গুরুত্ব নেই- যেমন জাতীয় ঐক্য, লক্ষ্য আকীদা, শৃঙ্খলা, গুরুত্ববোধ ইত্যাদি এককথায় যেসব বিষয়গুলি পৃথিবীতে আল্লাহর সংবিধান ও শাসন-প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করতে পারে সেগুলির প্রত্যেকটায় তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। কারণ হলো এই যে, আল্লাহর সংবিধান কোর'আন এবং রসুলের (দ.) হাদিস অনুযায়ী মানুষের জীবন শাসন ও পরিচালন করা হলে, আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী আদালতে বিচার করা হলে, আল্লাহর দেয়া দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি দেয়া হলে সমাজ থেকে ব্যক্তিগত অপরাধ নিজে থেকেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রমাণ ইসলামের প্রথম ৬০/৭০ বছরের ইতিহাস। অন্যদিকে ঐ কাজ না করে ব্যক্তিগতভাবে যত পুণ্যের-সওয়াবের কাজই করা হোক যত তাকওয়া করা হোক সমাজের সর্বপ্রকার অপরাধ বেড়েই চলবে, ফাসাদ-অন্যায়-অবিচার বেড়েই চলবে, যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি বেড়েই চলবে, ইবলিস সফল ও কৃতকার্য হবে। প্রমাণ বর্তমান পৃথিবী। এক কথায় বিশ্বনবীর (দ.) ও তার সাহাবাদের ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা আর আজকের আমাদের ধারণা বিপরীতমুখী। তাই বিশ্বনবীর (দ.) আসহাব অর্ধেক পৃথিবীকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন আর আজ এই জনগোষ্ঠী পৃথিবীর সব জাতির লাথি খাচ্ছি, আখেরাতেও আমাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে।

[যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৭১১৫৭১৫৮১]

সালাহ্ উম্মতে মোহাম্মদীর চারিত্রিক প্রশিক্ষণ

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে সম্পাদিত

আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে চরিত্র দরকার সে চরিত্র অর্জনের প্রক্রিয়া হচ্ছে সালাহ। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক উন্নতির ব্যবস্থা থাকলেও সালাতের মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুশৃঙ্খলভাবে নেতার আদেশ পালনে দুর্ধর্ষ অপরাজেয় সংগ্রামী চরিত্র সৃষ্টি। বর্তমানে পৃথিবীময় যে সালাহ বা নামাজ পড়া হয় এ সালাহ কি সেই চরিত্রের মানুষ তেরি করছে? অবশ্যই নয়; বরং ঠিক উল্টোটাই করছে। বর্তমানে সালাহ যে চরিত্রের জাতি সৃষ্টি করছে তা শত্রু দেখে ভীত, শত্রুর কাছে পরাজিত, লাঞ্ছিত, শত্রুর অবজ্ঞার পাত্র আর নিজেদের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা অনৈক্য আর বিভেদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত। কিন্তু বর্তমানে সালাতের এই উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সবাই সালাহকে ধ্যান হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যায় সালাতের ভেতর ধ্যান করা সম্ভব নয়। ধ্যান এবং সালাহ দু'টি বিপরীত জিনিস। ধ্যান করতে হয় নির্জনে গিয়ে, কিন্তু সালাহ কায়েম করতে হয় জামাতের সাথে যেখানে অনেক মানুষের সমাবেশ ঘটে। আবার ধ্যান করতে হয় চোখ বন্ধ করে, কিন্তু সালাতে সব সময় চোখ খোলা রাখতে হয়। পৃথিবীতে শুধু একটি বিষয়ের সাথে সালাতের মিল দেখা যায় আর তা হচ্ছে সামরিক কুচকাওয়াজ।

- **রসুলাল্লাহর কথা**

রসুলাল্লাহ (দ.) বলেছেন, ইসলাম একটি ঘর। এই ঘরের থাম, খুঁটি, স্তম্ভ হচ্ছে সালাহ আর ছাদ হচ্ছে জেহাদ [হাদিস- মুয়ায (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত]। ঘরের খাম, খুঁটি তৈরি করেও যদি উপরে ছাদ তৈরি না করা হয় তবে সেই ঘরে বসবাস করা যাবে না। আজ থাম, খুঁটি তৈরিকেই যথেষ্ট মনে করে সালাহ পড়া হচ্ছে আপ্রাণ চেষ্টা করে;

উপরে ছাদ তৈরির কথা ১৩০০ বছর আগেই ভুলে যাওয়া হয়েছে। আজকের এই বিকৃত ইসলামের ঘরের বহু থাম, খুঁটি স্তম্ভ আছে, ছাদ নেই; ছাদ নেই বলেই খ্রিষ্টান, ইহুদি, হিন্দু ও বৌদ্ধের হাতে পরাজয়, লাঞ্ছনা অপমানরূপে ঝড়, বৃষ্টি, প্রখর রোদ ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একে বসবাসের একেবারে অযোগ্য করে ফেলেছে। কিন্তু মুসলিম নামধারী এই জনসংখ্যার সেই বোধ নেই। আল্লাহ রসুলের (দ.) হাদিস থেকে এ কথা পরিষ্কার যে সালাতের উদ্দেশ্য হলো ছাদকে উপরে ধরে রাখা, জেহাদকে কার্যকরী করা। কিন্তু জেহাদ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করে জয়ী হওয়ার জন্য যে চরিত্র প্রয়োজন সেই চরিত্র সৃষ্টি করা; সুতরাং সালাহ জেহাদের প্রশিক্ষণ কাজেই জেহাদ, প্রচেষ্টা, সংগ্রাম যদি বাদ দেয়া হয় তবে সালাহ অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। যেমন যেকোন সামরিক বাহিনী যদি সংগ্রাম করা ছেড়ে দেয় তবে তাদের প্যারেড, কুচকাওয়াজ করা যেমন অর্থহীন যেমন ছাদ তৈরি করা না হলে খাম খুঁটি অর্থহীন।

• ইসলামের ভিত্তিই আজ অদৃশ্য

আল্লাহ ইসলামের যে ঘরটি অর্থাৎ জীবনব্যবস্থাটি ১৪০০ বছর আগে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার ভিত্তি আল্লাহর তওহীদ আজ নেই। আল্লাহর তওহীদ হলো তাঁর সার্বভৌমত্ব; অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র আইন কানুন দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আল্লাহর আদেশ নিষেধ ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ না করা; এক কথায় যেকোন বিষয়ে, যেখানে আল্লাহর ও তাঁর রসুলের (দ.) কোন বক্তব্য আছে, নির্দেশ আছে সেখানে পৃথিবীর আর কাউকে স্বীকার না করা। এই তওহীদ আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত কোনো রাষ্ট্রেও নেই, যে তওহীদ মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন। এর নিচে যা আছে অর্থাৎ আজ মুসলিম দুনিয়ায় যা চলছে তা শের্ক ও কুফর। তারপরে সেই ঘরের ছাদ জেহাদও নেই তাহলে রইল কি? রইল ঘরটার শুধু খাম, খুঁটি। এবং সমস্ত জাতি বিকৃত আকিদায় ঐ খাম, খুঁটিকে অর্থাৎ সালাহকে আঁকড়িয়ে ধরে আছে। যেহেতু তওহীদের দৃঢ় ভিত্তি নেই সেহেতু ঐ খাম, খুঁটি গুলিও আর খাম খুঁটি, স্তম্ভ নেই; ওগুলো ভঙ্গুর, ঠুনকো ও মৃদু আঘাতেই ওগুলো ধসে পড়ে যায়, ওগুলো আর কঠোর সংগ্রামী চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহর রসুলের বহুবারের দেয়া তাগিদ তোমাদের সালাতের লাইন ধনুকের ছিলার মত সোজা কর নাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখ পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিবেন, তাঁর আদেশ তোমাদের মেরুদণ্ড, ঘাড় সোজা করে সালাতে দাঁড়াও এসমস্ত কিছুই আজ ভুলে যাওয়া হয়েছে। এসব হুকুম না মুসুল্লিদের মনে না এমামদের মনে আছে। আল্লাহ কোর'আনে সুরা নিসার ১৪১-১৪২ নং আয়াতে মোনাফেকদের সালাতের কথা বোলতে গিয়ে বলেছেন মোনাফেকরা শৈথিল্যের সাথে সালাতে দাঁড়ায়। আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন 'কুসালা' যার অর্থ সাহস হারিয়ে ফেলা, অলসতা, ঢিলে-ঢালাভাবে। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নামক এ জাতির সালাতের দিকে তাকালে কুসালা শব্দের অর্থ বুঝতে কারো কষ্ট হবে না। সমস্ত বিশ্বে বর্তমানে এই সাহসহীন সালাহই চলছে। ফলে তাদের এই সালাহ গৃহীত হচ্ছে না।

[যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫]

ইসলামের প্রকৃত সালাহ্

আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মতে মোহাম্মদীর যে চরিত্র অপরিহার্য সেই চরিত্র তৈরির প্রশিক্ষণ হচ্ছে সালাহ (নামায)। অথচ সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে আজ সালাহকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সওয়াবের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। যে সালাহ উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা উম্মাহ আজ হাজারো পথে বিভক্ত। কারণ সালাহর প্রকৃত রূপ হারিয়ে গেছে। ইসলামের প্রকৃত সালাহর রূপ জানতে প্রতিটি সত্যানুরাগী মানুষের বইটি পড়া জরুরি।

hezbuttawheed.org

যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩ । ০১৭১১০০৫০২৫ । ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ । ০১৭৮২১৮৮২৩৭

সাইবার অপরাধ বাড়ছেই অভিযুক্ত ধর্মীয় নেতারাও

মোস্তাফিজুর রহমান অপু

ইন্টারনেটের ব্যবহার যত বাড়ছে তত বাড়ছে সাইবার অপরাধের ঘটনা। ফলে আর্থিক ক্ষতি থেকে নানা রকমের হয়রানির শিকার হচ্ছেন অনলাইন ব্যবহারকারীরা। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সাইবার অপরাধের অভিযোগে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে ঢাকা জেলায়। ঢাকার বাইরে বেশি মামলা চট্টগ্রাম জেলায়। সারা দেশ থেকে ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনালে আসা মামলার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মোট মামলার অর্ধেকের বেশি এসেছে মাত্র ১৫টি জেলা থেকে। মামলাগুলোর বেশির ভাগ করা হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায়। এই ধারার অপরাধ হচ্ছে অনলাইনে মিথ্যা ও মানহানিকর তথ্য, বিকৃত কিংবা অশ্লীল ছবি প্রকাশ করা।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন এ ধরণের অপরাধের সবচেয়ে ভয়ানক দিক হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও তাদের নেতারাও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য নিয়ে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এক শ্রেণির ধর্মীয় নেতা একে অপরের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। পরস্পরের মধ্যে মতের মিল না হলেই একে অপরের বিরুদ্ধে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এ ধরণের অপরাধমূলক পোস্ট, কমেন্ট করে থাকেন। সেগুলো আবার তাদের অন্ধ অনুসারীরা প্রচার করেন। মুহূর্তেই ভাইরাল করে দেন। সম্প্রতি হেযবুত তওহীদ এর শীর্ষনেতা হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম'র বিরুদ্ধেও দেশের বেশ কয়েকজন ধর্মীয় নেতার করা এ ধরনের সাইবার অপরাধমূলক কার্যক্রমের প্রমাণ মিলেছে। এ ধরণের একটি জালিয়াতির উদাহরণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। একটি ছবি ব্যবহার করে হেযবুত তওহীদের এমামের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একই ছবি ব্যবহার করে একজন আওয়ামী লীগ নেতার নামেও চালিয়ে দেওয়া হয়েছে বিএনপিপন্থী একটি ফেসবুক পেজ থেকে। অথচ মূলত ছবিটা সাউথ ইন্ডিয়ান একটি পর্ন ভিডিও থেকে নেয়া স্ক্রিনশট। পর্ন ভিডিও থেকে সুবিধাজনক জায়গায় স্ক্রিনশট নিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনলাইনে গুজব ছড়ানো হয়েছে।

২০১৩ সালে ঢাকায় একমাত্র সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। গত প্রায় ৮ বছরে সাইবার ট্রাইব্যুনালে ১২৪টি মামলার রায় হয়েছে। এর মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ২৯টি মামলায়। এই সময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে এক হাজার ১০০ মামলার। বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দুই হাজারের মতো। সাইবার ট্রাইব্যুনাল সূত্র থেকে জানা যায়, সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলা চলাকালে অনেক অভিভাবক এসে মামলা তুলে নেন এই বলেন যে তাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সে সুখে শান্তিতে আছে। তাই তারা আর মামলা চালাতে চান না। এমনকি উপজেলা চেয়ারম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তারাও সাক্ষ্য দেন মামলা চালালে মেয়ের ক্ষতি হতে পারে, তার সংসারে অশান্তি তৈরী হতে পারে। তাই মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া জরুরি। ফলে অনেক মামলা প্রত্যাহৃত হয়। জানা যায়, ট্রাইব্যুনাল থেকে রায় হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে নারীদের হয়রানি, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর স্ট্যাটাসসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে করা বিভিন্ন মামলা রয়েছে।

সাইবার অপরাধ ট্রাইব্যুনালে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৩ সাল থেকে গত ৩১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২৪টি মামলার রায় ঘোষণা করেছে সাইবার ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্যে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ২৯টি মামলায় আসামির সাজা হয়েছে। আর অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় ৯৫টি মামলায় আসামিরা বেকসুর খালাস পেয়েছেন। এর বাইরে অভিযোগ গঠনের শুনানির দিনেই মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন ২০০টিরও বেশি মামলার আসামিরা। সাইবার অপরাধে কিশোর-তরুণরা বাংলাদেশে অনলাইন এবং অ্যাপ ব্যবহার করে সাইবার অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। জুয়া, পর্নোগ্রাফি ও মানব পাচার কিছুই বাদ যাচ্ছে না। সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয়, এতে জড়িয়ে পড়ছে কিশোর-তরুণরা।

সম্প্রতি এক নারীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনায় ভারতের ব্যাঙ্গালুরু পুলিশ পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে একজনের নাম, এ ভি হৃদয়। তিনি 'টিকটক হৃদয়' নামে পরিচিত বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, টিকটক অ্যাপে কাজ করার প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচারের অপরাধ করে আসছিলো হৃদয়। তিনিসহ ভারতে আটককৃতরা বাংলাদেশ থেকে এক তরুণীকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে নির্যাতন করে। সেই ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরেই ভারতের পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে আরেকটি অনলাইন অপরাধী চক্রের সন্ধান পায় সিআইডি। এই চক্রটি 'স্ট্রিমকার' নামে একটি জুয়ার অ্যাপ ব্যবহার করে দেশের বাইরে টাকা পাচার করে আসছিলো। এই চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। তারা এই জুয়ায় বিটকয়েনসহ আরো কিছু অনলাইন মুদ্রা ব্যবহার করত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনার সূত্র ধরে কয়েক মাস আগে পুলিশ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর এলএসডি মাদকের সন্ধান পায়। এই মাদকের যোগাযোগও চলতো অনলাইনে। ফেসবুকে এই মাদক সেবন ও সরবারাহকারীদের একাধিক গ্রুপের সন্ধান পায় পুলিশ। এছাড়া গত বছরের অক্টোবরে অনলাইন পর্নোগ্রাফির সাথে যুক্ত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যলয়ের তিন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারা পর্নোগ্রফির বাজার গড়ে তুলেছিলো উন্নত বিশ্বে। নানা প্রলোভন আর বন্ধুত্বের আড়ালে তারা পর্নোগ্রাফি তৈরি করত। এর আগেও ২০১৪ সালে এরকম আরেকটি গ্রুপ ধরা পড়ে।

সাইবার অপরাধের প্রধান শিকার নারী: সাইবার হয়রানি থেকে সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগে একটি সাইবার হেল্প ডেস্কে রয়েছে। এই হেল্প ডেস্কে গত দু'বছরে ১৭ হাজারেরও বেশি অভিযোগ জমা পড়ে। দেখা যায়, অভিযোগকারীদের মধ্যে ৭০ ভাগই নারী। আরও সুর্দিষ্ট করে বললে, নারীদের অভিযোগের ৬০ ভাগেরও বেশি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক সংক্রান্ত। এর মধ্যে ১০ ভাগ অভিযোগ খুবই ভয়াবহ। এই ১০ ভাগের মধ্যে রয়েছে অন্যের ছবিতে ছবি জুড়ে দেওয়া (সুপার ইম্পোজ) এবং পর্নোগ্রাফি। তাছাড়া ইউটিউব ও বিভিন্ন সাইটে এসব পর্নোগ্রাফি ও ছবি আপলোড করার হারও বেড়েছে।

আইসিটি বিভাগের তথ্য থেকে জানা যায়, ফেসবুকের চ্যাট বা ভিডিও চ্যাটের ছবি একটু এদিকে-ওদিক করে বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিডিও-চিত্র দ্রুত ইউটিউব-এ বা বিভিন্ন পর্নো সাইটে শেয়ার করা হচ্ছে। হেল্প ডেস্ক থেকে আরো জানা যায়, অভিযোগ আসার দু-একদিনের মধ্যে ভুক্তভোগী যখন রিপোর্ট করতে যায় তখন দেখা যায় যে, তা কয়েক হাজারবার শেয়ার হয়ে গেছে। এসব ঘটনা ফেসবুকে রিপোর্ট করেও কাজ হয় না। ওদিকে গুগল তা মুছতে চায় না। ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সাইবার সিকিউরিটি সেলঃ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি করতে ১০ সদস্যের বিশেষ 'সাইবার সিকিউরিটি সেল' গঠন করেছে বিটিআরসি। কিন্তু নজরদারি শুরুর আগেই এর কার্যকারিতা নিয়ে শোনা যাচ্ছে নিরাশার কথা।

জানা যায়, ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন কন্টেন্ট-এর ওপর নজর রাখবে সাইবার সিকিউরিটি সেল। একইসঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, পর্নোগ্রাফি, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে উসকানিমূলক ও উগ্রবাদী কন্টেন্ট-এ নজর রাখবে এই সেল। সরাসরি আপত্তিকর কোন কন্টেন্ট পেলে তা সরিয়ে দেবে। এতদিন তারা শুধু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুরোধেই এই কাজ করতো। এখন সরাসরি করবে। এর আগেও ২০১২ সালে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল বিটিআরসি। তবে সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। সাইবার সিকিউরিটি সেলকে ঘিরে এখন কয়েকটি প্রশ্ন সামনে এসেছে।

১. বিটিআরসির সক্ষমতা
২. আইনগত দিক
৩. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
৪. ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্ব এবং
৫. ফেসবুক নিয়ন্ত্রণে দেশীয় আইন।

হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিটিআরসি পাবজি এবং ফ্রি ফায়ার গেম বন্ধ করতে পারেনি। বিটিআরসির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত রায় মৈত্রের ভাষ্য,'পুরোপরি বন্ধ করার সক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা আল-জাজিরার লিংকও বন্ধ করতে পারিনি। ফেসবুক ও গুগলকে চিঠি দেয়ার পরও তারা বন্ধ করেনি। আর ভিপিএন (ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক) ব্যবহার করে যারা সক্রিয়, তাদের চিহ্নিত বা বন্ধ করার কোনো প্রযুক্তি আমাদের কাছে নেই।' প্রযুক্তিবিদদের মতে, 'যদি নজরদারি করতে হয়, তাহলে বিটিআরসির

ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স সফটওয়ার লাগবে। এটা ছাড়া আসলে মনিটরিং সফল হয় না। আর এটা বিটিআরসির নেই। এর পাশাপাশি ফেসবুক বা অন্যান্যের সাথে আইনগত চুক্তি করতে হবে। ভারত ফেসবুকের কাছ থেকে এডিটিং প্যানেল নিয়েছে। আমাদেরও সেটা নিতে হবে। সেটা না পারলে বাস্তবে কোনো কাজ হবে না।'

বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যেসব লিংক বন্ধ করতে বিটিআরসিকে অনুরোধ করে তা জিজিটাল সিকিউরিটি আইনের আওতায় করা হয় বলে জানান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। এ ক্ষেত্রে তার ভাষ্য, 'ফেসবুক বা গুগলে বিটিআরসির সরাসরি হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগই নেই। আমাদের ওয়েবসাইট বা অনলাইন নেটওয়ার্কে বিটিআরসি হস্তক্ষেপ করতে পারে। কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাইলেই হস্তক্ষেপ করতে পারেন।' তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ এবং গুজব যেভাবে বাড়ছে, তাতে এটার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটা মানুষের বাক-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হলে পরিস্থিতি খারাপ হবে।

সাইবার মামলা তদন্তের জটিলতা: বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশের বিভিন্ন থানা মারফৎ বিচারের জন্য সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট মামলা এসেছে দুই হাজার ৬৪২টি। প্রতিবছরই মামলার সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৯ সালে ৭২১টি, ২০১৮ সালে ৬৭৬টি, ২০১৭ সালে ৫৬৮টি, ২০১৬ সালে ২৩৩টি, ২০১৫ সালে ১৫২টি, ২০১৪ সালে ৩৩টি এবং ২০১৩ সালে এসেছে ৩টি । চলতি বছরে ২৫৬টি মামলা হয়েছে। এখন পর্ন্ত সরাসরি ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা হয়েছে ১ হাজার ৮২টি মামলা। এর মধ্যে ৪৪৭টি মামলায় বিভিন্ন সংস্থাকে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। বাকি ৬৩৫টির প্রয়োজনীয় উপাদান না থাকায় আদালত খারিজ করে দেন। ৪৪৭টির মধ্যে ১৫০টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে আদালতে জমা হয়েছে। বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে সব মিলিয়ে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দুই হাজার ২১টি।

শুধু বিচার প্রক্রিয়া নয়, সাইবার মামলার তদন্তেও অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটের ভাষ্য, 'অনেক সময় তদন্তে অপরাধ প্রমান করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা অনেক ভিকটিম দেরিতে রিপোর্ট করেন। তিনি হয়তো একটা স্ক্রিন শট রেখে দেন। এখন যে ডিভাইস দিয়ে অপরাধ হয়েছে অপরাধী যদি ওই ডিভাইসটা বদলে ফেলেন তাহলে কিন্তু সিআইডির ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায় না। দেরিতে আসার কারণে অনেক আলামত নষ্ট হয়ে যায়। আবার অপরাধী দাবি করে বসেন, স্ক্রিন শটটি বানানো। সে হয়তো পোষ্টটা ডিলিট করে দিয়েছে। ফলে এমন কোন তথ্য উপাত্ত নেই যেটা দিয়ে প্রমাণ হয় অপরাধী আসলে অপরাধটি করেছে। ভার্চুয়াল বিষয়ের মামলাগুলোতে শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বেই চ্যালেঞ্জ অনেক। পাশাপাশি দক্ষ জনবলের অভাব তো আছেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংকট কাটানোর চেষ্টা চলছে।'

ডিএমপির সাইবার ক্রাইম ইউনিটের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নাজমুল ইসলাম বলেন, 'সমস্যা হচ্ছে সাইবার অপরাধের ধরন প্রতিদিনই পাল্টে যাচ্ছে। আমরাও সেই অনুযায়ী আমাদের তদন্ত, অনুসন্ধান এবং প্রযুক্তি আপডেট করছি। ঢাকায় সাইবার অরপরাধ দমনে আমরা সক্ষম। কিন্তু সারাদেশে সেই সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। তবে কাজ চলছে। প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি হচ্ছে।' উল্লেখ্য, সাইবার অপরাধ বা কম্পিউটার অপরাধ এমন একটি অপরাধ যা কম্পিউটার এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কিত। কম্পিউটার একটি অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বা এটা নিজেই লক্ষ্য হতে পারে। দেবারতি হালদার ও কে জয়শংকর সাইবার অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'আধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট (চ্যাট রুম, ইমেল, নোটিশ বোর্ড ও গ্রুপ) এবং মোবাইল ফোন (এসএমএস/এমএমএস) ব্যবহার করে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানি, কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি, বা ক্ষতির কারণ হওয়া।

সাব এডিটর, দৈনিক বজ্রশক্তি

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ত্যাগী সংগঠনগুলোও ব্যর্থ হচ্ছে কেন?

রিয়াদুল হাসান

জাতীয় জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দলগুলোর এমন অগণিত আন্তরিক কর্মী আছেন যাদের ত্যাগ সত্যিকার অর্থেই উদাহরণযোগ্য। ইসলামের জন্য তারা যে কোনো মুহূর্তে জীবন পর্যন্ত কোরবান করতে প্রস্তুত। তাদের উদ্দেশে আমরা সবিনয়ে দুটো কথা বলতে চাই।

প্রথম কথাটি হচ্ছে, ইসলাম হলো আল্লাহর দেওয়া দীন, এর নাম আল্লাহ দিয়েছেন সেরাতুল মোস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ। সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহর সঙ্গে ইবলিসের যে চ্যালেঞ্জ হয়েছিল সেখানে ইবলিস বলেছিল যে, সে এই সেরাতুল মোস্তাকীমে

মানুষকে থাকতে দেবে না, সে এই জীবনপদ্ধতিটি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। সে এই পথের ডানে-বামে, উপরে-নিচে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে এবং মানুষকে আক্রমণ করে এই মহান পথ থেকে সরিয়ে দেবে। কাজেই সত্যদীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষকে এমন এক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হবে যাকে সে দেখতেই পায় না, যে বিভিন্ন রূপে এসে মানুষকে প্রতারিত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে আল্লাহর সাহায্য তার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি দিয়েই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ কাকে সাহায্য করবেন?

আল্লাহ সাহায্য করবেন কেবল তাকেই যে মো'মেন। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ যত ওয়াদা করেছেন সব মো'মেনদের জন্য, তাঁর সকল সাহায্যও মো'মেনদের জন্যই। তিনি বলেছেন, তোমরা নিরাশ হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মো'মেন হও (সুরা ইমরান ১৩৯)। মো'মেন কে সেটাও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, "মো'মেন শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর কোনো সন্দেহ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম করে)। তারাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ (সুরা হুজরাত ১৫)। কাজেই যারা তওহীদের উপর অটল থেকে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন-সম্পদ সব উজাড় করে দিয়ে সংগ্রাম করবে তারাই হলো মো'মেন। আল্লাহর সাহায্য শুধু তাদের জন্যই।

ইসলাম আজকে হাজারো রূপ নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর যে কোনো একটি রূপকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করলেই কি মানুষ আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন হয়ে যাবে আর আল্লাহও সাহায্য করতে শুরু করে দিবেন? অবশ্যই না। যারা আল্লাহর নাজেল করা সেই প্রকৃত ইসলামের অনাবিল রূপটিকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন বলে পরিগণিত হবেন। আর আল্লাহর নাজেল করা সেই সত্য ইসলামটিকে প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ সাহায্য করবেন। ইবলিসের প্ররোচনায় পড়ে মুসলমান জাতি এখন হাজারো ফেরকা মাজহাবে তরিকায় বিভক্ত হয়ে যার যার ইচ্ছামত ইসলাম পালন করছে। সেই পথগুলো ইবলিসের পথ, সেগুলো সেরাতুল মোস্তাকীম নয়। সেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যতই সর্বস্ব কোরবান করি না কেন, যতই পাগলপারা হই না কেন সেখানে আল্লাহর কোনো সাহায্য আমরা পাবো না। কথা হলো, আজকে যারা ইসলামকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছেন তারা যে ইসলামটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন সেটা আল্লাহ-রসুলের সেই প্রকৃত ইসলাম নয়, সেটা তেরশ বছরের বিকৃতির ফসল। যে ইসলামটি ১৪শ' বছর আগে অর্ধেক দুনিয়ার মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল, যে ন্যায়বিচার ও সাম্যের পরিচয় পেয়ে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অধিকারহারা, দলিত মানুষ দলে দলে বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলামকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বর্বর মানুষগুলো যে পরশপাথরের ছোঁয়ায় রাতারাতি সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল সেই ইসলাম আজ এই সংগঠনগুলোর কাছে নেই। এগুলো হলো ফেকাহ-তাফসির নিয়ে কূটতর্কের ইসলাম, জটিল মাসলা-মাসায়েলের ইসলাম, ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা স্বার্থের প্রয়োজনে শতভাবে বিকৃত ইসলাম।

তৃতীয়ত, আল্লাহ তাঁর রসুলকে সমগ্র পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি নিখুঁত ও শ্বাশ্বত কর্মসূচি দান করেছেন। শ্বাশ্বত বললাম এই জন্য যে, আল্লাহর রসুল এই কর্মসূচিটি বর্ণনা করার পূর্বেই বলে নিয়েছেন, "আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ করেছেন। আমিও তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের জন্য আদেশ করছি।" তাহলে এই পাঁচটি কাজ কী? সেট হলো- আল্লাহর রসুল বললেন, "(১) তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, (২) তোমরা সুশৃঙ্খল থাকবে, তোমাদের নেতার আদেশ শুনবে, (৩) তোমাদের নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, (৪) সকল শেরক-কুফরকে পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ হেজরত করবে, (৫) আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ (সংগ্রাম) করবে।

> ***তারা যে ইসলামটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছেন সেটাও আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, এমন কি তাদের অনুসৃত কর্মসূচিও আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি নয়। এই কারণে আল্লাহর সাহায্য তাদের সঙ্গে নেই। এখন আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে হলে তাদেরকে মোমেন হতে হবে, ইসলামের প্রকৃত আকিদাকে ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর দেওয়া যে কর্মসূচি রসুলাল্লাহ নিজে অনুসরণ করে গেছেন এবং তাঁর নিজ হাতে গড়া উম্মাহকে দান করে গেছেন সেই কর্মসূচির মাধ্যমে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে, নিজেদের জীবন ও সম্পদ সেই সঠিক পথে ব্যয় করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।***

এই কর্মসূচিটির বাইরে ইসলাম নেই। যে যত বড় সংগঠনই করুক না কেন, সংগঠন যতই প্রাচীন হোক না কেন, তাদের জনসমর্থন যত বেশিই হোক না কেন, এই কর্মসূচি হচ্ছে রসুলের কর্মসূচি যা তিনি উম্মাহর উপর অর্পণ করে গেছেন, এই কর্মসূচিকে গ্রহণ না করে, নিজেদের মনগড়া কর্মসূচি বানিয়ে নিয়ে কোনোভাবেই আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন হওয়া সম্ভব নয়, সাহায্যের উপযুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। এটা আমাদের কথা নয়, স্বয়ং রসুল এই হাদিসটিতে পাঁচটি কাজের তালিকা বলার পর বলছেন, "যারা এই ঐক্যবন্ধনী থেকে আধহাত পরিমাণও বহির্গত হয়ে যাবে তাদের গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা জাহেলিয়াতের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ ভিন্ন কর্মসূচির দিকে বা ভিন্ন মতবাদের দিকে) তারা জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে, যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এমন কি নিজেদেরকে মুসলিম বলে বিশ্বাসও করে। (হাদিস-হারিস আল আশয়ারি (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিজি, বাব-উল-ইমারত, ইবনে মাজাহ)।

যে কর্মসূচি আল্লাহ দেন নি সেই কর্মসূচির অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ বিজয় প্রদান করতে, সাহায্য প্রদান করতে দায়বদ্ধ নন, তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দায়বদ্ধ তাঁর প্রদত্ত কর্মসূচির অনুসারীদের প্রতি। আমাদের ভুললে চলবে না, রসুলাল্লাহর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যবাহী দিন হচ্ছে মক্কাবিজয়ের দিন। সেই মহাবিজয়ের দিনে তিনি তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছিলেন, "এই

যে বিজয় তোমরা দেখছ, এটা আল্লাহ একা করেছেন। আল্লাহ একা করেছেন।" সেই বিজয়ের পেছনে রসুলাল্লাহর কত রক্ত গেছে, কত সাহাবীদের শহীদ হতে হয়েছে, কী পরিমাণ নির্যাতন নিপীড়ন তাঁরা সয়ে তিলে তিলে এই বিজয়ের দিনটি নির্মাণ করেছে সবই আমরা জানি। কিন্তু রসুলাল্লাহ তাঁর ও তাঁর সাহাবিদের কোনো ত্যাগের কথা, কোনো অবদানের কথাই স্বীকার করলেন না, বললেন "আল্লাহ একা করেছেন।" হ্যাঁ। এটাই সত্য। আল্লাহ যদি তাঁকে এই সংগ্রামে সাহায্য না করতেন, তাহলে উম্মাহর এই বিজয় স্বপ্নই থেকে যেত। কারণ নব্যুয়তের প্রথম দিন থেকে শুরু করে ঐ দিন পর্যন্ত এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যেখানে গোটা জাতিই ধ্বংসের উপক্রম হয়েছিল। হিজরতে আল্লাহর সাহায্য, বদরে আল্লাহর সাহায্য, আহযাবের দিন আল্লাহর সাহায্য, হোদায়বিয়ার সন্ধিতে আল্লাহর সাহায্য যদি না থাকতো তাহলে উম্মাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কাজেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ইসলামি আন্দোলন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তাদের পাহাড়প্রমাণ ত্যাগ থাকলেও পারবে না।

তবে হ্যাঁ, কোনো কারণে কোনো ভূখণ্ডে যদি রাজনৈতিক, যুদ্ধাবস্থা বা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এমন পরিস্থিতি হয় যে কোনো একটি ইসলামি দল বা জোট ক্ষমতায় যেতে পারল (যেমনটা আফগানে হয়েছিল, ইরাক সিরিয়ার কিছু অংশে হয়েছিল, তিউনেশিয়া, মিশরে হয়েছিল) কিন্তু সেই ক্ষমতা তারা টিকতে পারবে না। কারণ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে এখন দাজ্জাল অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা যার অন্যতম লক্ষ্যই হলো ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। তারা ইসলামি দল বা জোটকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না, নির্বাচনে জিতে আসলেও দেবে না, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলেও দেবে না। এই দলগুলো যে কয়দিন ক্ষমতার চর্চা করতে পেরেছে, তাদের হাতে থাকা শরিয়তের শাসন কায়েম করেছে ততদিন কি মানুষ ইসলামের শান্তি লাভ করেছে? ইসলামি দলগুলোয় যোগ দেওয়ার জন্য ঐ সব এলাকার নর-নারীদের মধ্যে বাঁধভাঙা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে? না। বরং উল্টো হয়েছে। মানুষ তাদের আরোপ করা 'ইসলাম'কে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবর্তে তারা ভীত ও আতঙ্কিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম তো বটেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একটি বিরাট অংশ বিদ্বেষপ্রবণ হয়ে উঠেছে যার পেছনে কেবল পাশ্চাত্যের প্রোপাগান্ডাই একচেটিয়াভাবে দায়ী নয়, এর দায় ঐ ইসলামী দলগুলোর ধর্মান্ধতা, শরিয়তের বাড়াবাড়ি, জবরদস্তি, ফতোয়াবাজি, শিল্প-সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদিতা, নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বিধর্মী ও ভিন্নমতের সঙ্গে বর্বর নৃশংসতার প্রদর্শনী ইত্যাদিও সমধিক দায়ী।

অথচ হওয়া উচিত ছিল সম্পূর্ণ উল্টোটা অর্থাৎ মানুষ দলে দলে সত্যকে আলিঙ্গন করে নেবে এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের সৌন্দর্যকে পুষ্পিত করে তুলবে। সেটা হয় নি কারণ ১৪ শ' বছর আগের সেই ইসলাম তাদের কাছে নেই। তাই তারা পুরো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে হত্যা করেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তাদের কোরবানি যতই বৃহৎ হোক, নিয়ত যতই সহীহ হোক, নিজেদেরকে তারা যতই শহীদ মনে করুক।

আমাদের এই কথা যদি তাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে তারা কয়েক শত বছর ধরে যেমন চেষ্টা করে যাচ্ছেন তেমনিভাবে আরো হাজার বছর সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কারণ তারা যে ইসলামটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছেন সেটাও আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, এমন কি তাদের অনুসৃত কর্মসূচিও আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি নয়। এই কারণে আল্লাহর সাহায্য তাদের সঙ্গে নেই। এখন আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে হলে তাদেরকে মোমেন হতে হবে, ইসলামের প্রকৃত আকিদাকে ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর দেওয়া যে কর্মসূচি রসুলাল্লাহ নিজে অনুসরণ করে গেছেন এবং তাঁর নিজ হাতে গড়া উম্মাহকে দান করে গেছেন সেই কর্মসূচির মাধ্যমে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে, নিজেদের জীবন ও সম্পদ সেই সঠিক পথে ব্যয় করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

[লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট
ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১,
০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৭১১-৫৭১৫৮১]